Cadence

বিইউপি বার্ষিক ম্যাগাজিন-২০২৩

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতা	:	**মেজর জেনারেল মোঃ মাহ্বুব-উল আলম**, বিএসপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল, পিএইচডি
প্রকাশকাল	:	ডিসেম্বর ২০২৩
বিইউপি বার্ষিক প্রকাশনা	:	৬ষ্ঠ
প্রকাশক	:	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)
কভার ডিজাইন	:	সহকারী পরিচালক মুহাম্মাদ কাউছার মাহমুদ
সহায়তাকারী	:	কম্পিউটার অপারেটর মোঃ মঈনুল ইসলাম চৌধুরী কম্পিউটার অপারেটর মোঃ রাজীব হোসেন কম্পিউটার অপারেটর মোঃ ফারুক হোসেন গ্রাফিক্স ডিজাইনার মাহ্মুদুর রহমান (ডিজাইন অ্যান্ড ক্যালিব্রেশন)

প্রকাশনায়

অফিস অব দ্য পাবলিক রিলেশন্স, ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৮৮-০২-৮০০০৩৬৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮০০০৪৪৩
ই-মেইল: info@bup.edu.bd, ওয়েবসাইট: www.bup.edu.bd

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মেজর জেনারেল মোঃ মাহ্‌বুব-উল আলম, বিএসপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল, পিএইচডি

উপদেষ্টা
অধ্যাপক খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন, পিএইচডি

প্রধান সমন্বয়কারী
এয়ার কমডোর মাহমুদ মেহেদী হুসেইন, পিএসসি, জিডি (পি)

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক
গ্রুপ ক্যাপ্টেন ফজলে কাদের চৌধুরী, বিপিপি, শিক্ষা

লে: কর্নেল সিরাজ উদ্দিন আহমেদ (অব:) পিএসসি

সহযোগী অধ্যাপক ড. ফাহমিদা হক

অতিরিক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ শওকত ওসমান

অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর

কর্ড টু চিফ মেজর জিয়া মাহমুদ খান, আর্টিলারি

উপ-পরিচালক মেজর মমতাজ আলা শিব্বির আহম্মেদ (অবঃ)

মেজর মোঃ সাবির আহমেদ, পিএসসি (অবঃ)

সহকারী অধ্যাপক মোঃ মইনুল ইসলাম

সহকারী রেজিস্ট্রার মোঃ সাইফুল ইসলাম

সহকারী পরিচালক মুহাম্মাদ কাউছার মাহমুদ

সহকারী প্রোগ্রামার প্রলয় মুখার্জী রতন

সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ ওসমান গণি

বাণী

উপাচার্য
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে পাঠ্যপুস্তকনির্ভর জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সহশিক্ষা কার্যক্রমের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা এই সহশিক্ষা কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় সঞ্চলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায়। মানবসত্তার উৎকর্ষ সাধনে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একেকজন সৃজনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস প্রতি বছরের ন্যায় এবারও প্রকাশ করেছে বার্ষিক ম্যাগাজিন ‘CADENCE’।

‘CADENCE’ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবিম্বস্বরুপ। বুদ্ধিদীপ্ত চেতনা, জ্ঞান, মেধা ও অভিজ্ঞতার নান্দনিক প্রকাশ ঘটেছে ম্যাগাজিনের প্রতিটি লেখায়। দেশপ্রেম, জাতীয় ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে ‘CADENCE’ বিইউপির সকল সদস্যের মনোজাগতিক বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সৃষ্টিশীল এই রচনাবলির শিল্পশৈলী পাঠকহৃদয়কে আলোড়িত করবে; যা সমাজ বিনির্মাণে অবদান রাখবে বলে আমি আশাবাদী।

পরিশেষে এই বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী এবং সম্পাদনা পর্ষদের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সকলের সহায় হোন।

মেজর জেনারেল মোঃ মাহবুব-উল আলম, বিএসপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল, পিএইচডি

বাণী

উপ-উপাচার্য
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

Cadence-এর ষষ্ঠ প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট আয়োজকের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন!

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি) শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন জ্ঞানচর্চার দ্বার উন্মোচনে সদা সচেষ্ট। এরই ধারাবাহিকতায় ইংরেজী নববর্ষ ২০২৪-এ বিইউপি হতে প্রকাশিত 'Cadence' ম্যাগাজিন সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। বিইউপির শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ও সৃজনশীলতা চর্চার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এই ম্যাগাজিনটির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নিয়মিত অবদান রাখার উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। এটি এমন একটি ম্যাগাজিন যেখানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের নানা ধরনের সৃজনশীল লেখা থাকে যা শিক্ষার্থীদের সহশিক্ষাসহ নানা ধরনের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার যথার্থ প্রতিফলন ঘটে।

মানসিক উৎকর্ষ ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীদের এ ধরনের জ্ঞান অন্বেষণ অতি প্রয়োজনীয়। আর এ লক্ষে ম্যাগাজিনটি বিইউপির শিক্ষার্থীদের সকল ধরনের সৃজনশীল লেখনীর মুখপাত্র হিসেবে একান্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করছে বলে আমি মনে করি। মননশীল এবং সৃজনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এ ম্যাগাজিনের অবদান সবার জন্য অনন্য ও ব্যতিক্রমধর্মী। জ্ঞানের নিত্য-নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার লক্ষ্যে এ ম্যাগাজিনের মাধ্যমে আমরা বিইউপি পরিবার ভবিষ্যতে আরো অধিকমাত্রায় সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কর্মযজ্ঞে সক্রিয় হব-এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

এ প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন! আমি এ ম্যাগাজিনের সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করছি।

M Hossain

অধ্যাপক খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন, পিএইচডি

প্রধান সমন্বয়কারীর বাণী

প্রধান সমন্বয়কারী
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

পুঁথিগত জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিইউপি এ বছর তার বার্ষিক ম্যাগাজিন ‘Cadence’ এর ৬ষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। মূলত সৃজনশীল ও গঠনমূলক লেখনির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিইউপির এই মহতী উদ্যোগ।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, এ প্রকাশনায় বিইউপির শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থী রচিত সমসাময়িক বিষয়ভিত্তিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও স্মৃতিচারণমূলক বিভিন্ন প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, ছোট গল্প ও কবিতা স্থান পেয়েছে। এই লেখাগুলো আমাদের চিন্তাশক্তিকে আরো শাণিত করবে এবং প্রতিভাকে আরো বিকশিত করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি নিশ্চিত ‘Cadence’ এর এই ৬ষ্ঠ সংখ্যা ভবিষ্যতে আরও শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদেরকে সৃজনশীল লেখনির জন্য আকৃষ্ট করবে।

পরিশেষে, যে সকল সৃজনশীল লেখক তাদের লেখনির মাধ্যমে এ প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাদের এবং যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই ম্যাগাজিনটি আলোর মুখ দেখেছে তাদের জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

এয়ার কমডোর মাহমুদ মেহেদী হুসেইন, পিএসসি, জিডি (পি)

সম্পাদকীয়

প্রধান সম্পাদক
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এর যুগোত্তীর্ণ সৃজনশীলতা, জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত আমাদের প্রতিভাবান ছাত্র-শিক্ষক, সম্মানিত সদস্যগণের মনোমুগ্ধকর নিবন্ধ এবং চিন্তা-উদ্দীপক লেখনীর একটি অসামান্য সংগ্রহ উপস্থাপন করতে পেরে আমি আনন্দিত। এই সংস্করণটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রশংসনীয় অর্জনসমূহকে প্রতিফলিত করে। এই ম্যাগাজিনের লেখাসমূহ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবধারা ও অর্জনসমূহকে সংজ্ঞায়িত করে। শিল্প ও সাহিত্যের ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিশ্রণে যে নান্দনিকতা প্রতিভাত হয়, এই ম্যাগাজিনের লেখাসমূহে তার দ্বারা প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রধান সম্পাদক হিসেবে আমি এই ম্যাগাজিন প্রকাশনার সাথে জড়িত সকল অবদানকারীর উৎসর্গ ও প্রতিশ্রুতি অবলোকন করে গর্ববোধ করছি। সৃজনশীলতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দর্পন হিসেবে 'Cadence' ম্যাগাজিন ২০২৩ এর এই সংস্করণটি পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি সমগ্র সম্পাদকীয় দলের সকল সদস্যদের কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুত অঙ্গিকার এই ম্যাগাজিনের প্রতিটি শব্দ, চিত্র এবং বিন্যাসে প্রতিভাত। এই সাহিত্য পাঠের হবার জন্য সকলকে অশেষ ধন্যবাদ।

গ্রুপ ক্যাপ্টেন ফজলে কাদের চৌধুরী, বিপিপি, শিক্ষা

“শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ”

সূচিপত্র
বিইউপি ম্যাগাজিন-২০২৩

ক্র/নং	শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা নং
০১	Bangladesh University of Professionals (BUP): Holism and Fusion in Higher Education	Maj Gen Mohammad Quamruzzaman (Retd)	১
০২	Building a Better Bangladesh: The Power of Youth as Changemakers	Major Md. Sabir Ahmed (Retd)	৪
০৩	Public Administration in the Age of Fourth Industrial Revolution	Mohammad Nur Ullah	৯
০৪	Making the Most out of BUP Life	Rahat Ahmed Shimanto	১২
০৫	An Unpaid Debt: Gratitude for Lifetime	Jannateen Naoar Siena	১৪
০৬	Ripples of Resilience: The Elegy of Female Role Models in Young Minds	Anika Meher Amin	১৬
০৭	Digital Addiction and the Changing Pattern of Family Relationships	Jannatul Ferdous Ety	১৮
০৮	Caged	Azharul Islam	২০
০৯	Acquaintance	Tasnim Naz	২২
১০	Renovating Historical Heritages: Quest for Boosting Tourism in Bangladesh	Helal Uddin	২৪
১১	Gratitude on Your Own Soul	Mst. Fatema Binta Alam Jim	২৭
১২	My Mind is a Dark Void	Tasneem Azim	২৯
১৩	The Horrors of Failure and the need to ~~Escape~~ Embrace it	Nazifa Tabassum	৩১
১৪	The Lake by the Campus	Nashita Shahid	৩৩
১৫	Debauched with Dewy Rain	Nujhat Aslam	৩৫
১৬	Yearning for Turn	Nishat Anjum Risa	৩৬
১৭	The Symphony of Success	Mohammad Fahim Faysal	৩৭
১৮	Ode to a Happy Child	Nahreen Saleha Shahadat	৩৯
১৯	A New Sunrise	Shurovi Akter	৪১
২০	Cunning Maze	Nuri Shahrin Suba	৪২
২১	Power of Knowledge	Tahmina Sultana	৪৩
২২	A Love Song from Nature: Harmony in Bloom	Most. Shanzida Islam Prithibi	৪৪
২৩	Negligence	Most. Fatema Tuz Jannat Noor	৪৫
২৪	Rising From Ashes	Maliha Ahsan	৪৬
২৫	Don't be Stressed	Ridwana Islam Ruhama	৪৭
২৬	Illusory	Azra Mahjabin Nirjhor	৪৮
২৭	Sayonara BUP	Shahrukh Khan Akash	৫০
২৮	When I was a Child	Asia Begum Shupti	৫২
২৯	Death	Rubayet Sanzina Ranila	৫৩

সূচিপত্র
বিইউপি ম্যাগাজিন-২০২৩

ক্র/নং	শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা নং
৩০	পঞ্চাশ বছরের বাংলাদেশ: কী পেলাম, কী পেলাম না	ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন	৫৪
৩১	রাজা ইডিপাস ও প্রাচুর্যের নিরর্থকতা	ড. মোঃ মোহসীন রেজা	৫৭
৩২	তেলিয়াপাড়ার যুদ্ধ	লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান নিয়াজ	৬০
৩৩	২০ এর একুশ	আসিব হোসেন	৬৫
৩৪	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে শিক্ষা এবং গবেষণা	ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	৬৮
৩৫	কর্মজীবী মা ও বন্ধুরা	তাহেরা দিল আফরোজ	৭০
৩৬	সংসার	মাসুমা ইবতেকার নাবিলা	৭৩
৩৭	বেলা শেষের গল্প	এস এম নাফিজ উল আলম	৭৪
৩৮	লাবণ্যের লতা	জাওহারা রহমান জর্জিয়া	৭৬
৩৯	বন্ধুত্ব	ইমরানুল হক চৌধুরী	৭৮
৪০	পরম নির্ভরতা	মোহাম্মাদ তামজিদ আব্দুল্লাহ	৮১
৪১	বাবা এবং মেয়ে	তাসনুভা রহমান লাবিবা	৮৩
৪২	মৃত্যু নদীর সাঁতারু	সঞ্জয় বসাক পার্থ	৮৫
৪৩	সুখ	জান্নাতুল ফেরদৌস	৮৭
৪৪	দরিদ্রতা	মোঃ তৌফিকুল ইসলাম	৯০
৪৫	গন্তব্য-বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস	ইমতিয়াজ আহমেদ	৯১
৪৬	আমার শখ: চিঠি লেখা ও পোস্টকার্ড সংগ্রহ	জাহরা আনজুম	৯২
৪৭	একটি সুযোগ: আমার ভারত ভ্রমণ	এস এম নাহিদ সারোয়ার সুমন	৯৪
৪৮	মনের বিষাক্ততা দূরীকরণে প্রমোদভ্রমণের গুরুত্ব	মোঃ শরীফুল হাসান খান	৯৭
৪৯	নিম্নবিত্ত মেয়ের গল্প	মেজর মোঃ মাহবুব আলম	৯৯
৫০	বাতাসের উচ্ছ্বাসে	আল জামাল মোস্তফা সিন্দাইনী (তমাল)	১০১
৫১	মানুষ	সামসেরি এ মাওলা লামিয়া	১০২
৫২	সূর্যমুখী ও বিইউপি	মোঃ মোজাম্মেল হক	১০৪
৫৩	পিতা মাতা	মোঃ মশিউর রহমান অন্তর	১০৬
৫৪	পাউলোনিয়া	মোঃ কাইয়ুম আলী	১০৭
৫৫	হিমালয়ের বিশালতা	নুরুজ্জামান শিশির	১০৮
৫৬	ঘোড়-সওয়ারের জবানবন্দী	সৌমেন গুহ	১০৯

BANGLADESH UNIVERSITY OF PROFESSIONALS (BUP): HOLISM AND FUSION IN HIGHER EDUCATION

Major General Mohammad Quamruzzaman (Retd)
Adjunct Professor
Faculty of Business Studies

Introduction

Bangladesh University of Professionals (BUP) is a unique public university among 3 international, 54 public and 112 private (total 169) universities. Under-graduate, graduate and post-graduate programs at BUP follow holism and fusion. Holism in a university means integrating multidisciplinary academic faculties, colleges and institutes to a process-plus powerful whole. Fusion in higher education is synthesizing several academic subjects for synergistic cognitions of graduates. Oldest Bologna University (1088) and other mediaeval universities adopted holism and fusion through *quadrivium* (arithmetic, geometry, music and astronomy) and *trivium* (grammar, logic and rhetoric) called liberal arts.

Latin *universitas magistrorum et scholarium,* "the community of teachers and scholars" is university. BUP Act 2009 made BUP community large and higher education holistic unifying national security, war strategy, medicine, engineering and technology. It urged for maintaining the international need and standard affiliating tri-services colleges, institutes, academies, schools and training centres. Act mentions on modern education systems at national level carrying out researches and striving for continuous improvement. BUP is a flagship among 7 military universities fulfilling Article 17 of the Constitution. It entrusts the State to adopt effective measures for the purpose of establishing a universal education system to meet the needs of society: local, regional and global.

Portmanteau Glocal for Holism and Fusion at BUP

Systems at BUP emphasize conforming to global scenario. *Glocal* is the portmanteau of *global* and *local*. UN Sustainable Development Goals (SDG) by 2030 in Goal-4 mentions about quality education besides quantity. Our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman forecasted defence services' potentials in higher education while addressing the BMA gentleman cadets on 11 January 1975 at Cumilla, "InshaAllah, the days will come when not only South Asia but whole World will appreciate our quality of training and education." 56-acre BUP campus is a super-fusion of land-water-light-air at Mirpur Cantonment.

BUP's vision is to emerge as a leading university for professionals through need-based education and research with global perspective. Mission of BUP is to develop the civil and military human capitals through advanced education and research to respond to knowledge-based society of contemporary World. *Professionals* possess special connotation and denotation as per BUP Act 2009, Section 2 (19) definition. BUP's organic 8 faculties/centres and 56 affiliated colleges/institutes run 94 programs in *glocal* context and content. Public and private dichotomy got a positive turn at BUP through public and private partnership (PPP). Same is with civil and military ties in senate, syndicate and academic council.

Rationale of Defence Services for Holism and Fusion in Higher Education

Polemology is defence/war study, a mother academic discipline/subject of higher education. Greek God of battle *Polemos* and a mythological hero *Academus* saved *Athens* named after *Athena*, goddess of wisdom. Etymology and semantics of such words and concepts provide the rationale of defence services in higher education to achieve "Excellence through Knowledge". Multidisciplinary fusion of science, technology, engineering and mathematics (STEM) with humanities, social science, business administration and strategy ensure knowledge economy. Polymath Pythagoras used *quadrivium* aiming the victory of *Croton* over *Sybaris* in 510 BC.

Socrates coined the term *Philosophy*: Greek *Phil* is love, *Sophia* is wisdom. Plato and Aristotle provided philosophical solutions to universal problems adopting holism and fusion. Alexander became a soldier-emperor. Epistemology confirms that universities were founded on human learnings to survive and sustain fighting adversaries: demons, rivals, animals, diseases, and calamities. *Strategy* comes from Greek *Strategia* - the generalship and art in defence and war. Shakespeare's and Tagore's characters were mostly polemologic heroes and victims. SunTzu, Koutilya, Caesar, Machiavelli, Napoleon, Churchill, Gandhi etc have relevance and rationale in higher education.

Unifying -logy, -ism, -gony, -ics, -cracy, -gogy, -sophy etc in Higher Education

Hesiod's *Theogony*, Valmiki's *Ramayana*, Vyasa's *Mahabharata*, Homer's *Iliad* and *Odyssey* etc depict defence/war which are the primary sources of various -logy, -ism, -gony, -ics, -graphy, -gogy, -sophy etc. Chaos of gods-goddesses as *Titans* and *Olympians* is Greek mythical cosmogony. Lord Krishna's wisdom caused 5 *Pandava* brothers' victory against 100 *Kourava*'s. Kurukshetra (Haryana) dialogue and discourse of Krishna with Arjun is *Bhagavad Gita*. Epistemology of peace-conflicts follows fusion and holism of all academia. BUP is a centre for excellence uniting such -logy, -ism, -ics, -gogy, sophy etc efficiently. *Russo-Ukrainian* war and peace study make holism with Tolstoy's *War and Peace* that depicts Napoleonic era on Tsarist society.

UN was born as the consequence of holistic WW I & II. UNU at Tokyo is a peace and conflict research UN University for World peace. UN Secretary General (1953-1961) Dag Hammarskjöld had a paradox, "Peacekeeping is not a job for soldiers, but only soldiers can do it". Bangladesh Institute of Peace Support Operation and Training (BIPSOT) may get the epistemological options for holistic solutions of paradoxes and fallacies getting affiliated to flagship military university BUP and becoming a UNU. Sports play a lot in holism and fusion-Bangladesh Krira Shikkhya Protistan (BKSP)' affiliation to BUP will help higher education holism.

Holism and Fusion for Quantitative and Qualitative Higher Education

Qualitative education at BUP is maintained with quantitative increase. BUP has exchange programs internationally. Monash University, named after Lt-Gen John Monash of WW-I accepts BUP graduates for continued curricula. BUP signed MoU with Macquarie University, named after Maj-Gen Lachlan Macquarie, colonial administrator in Australia. Teaching and learning relate to prefixes peda- (child), andra- (adult) and heuta- (self). Higher education demands andragogy and heutagogy unlike full pedagogy followed in lower levels. BUP emphasizes on heuristics: seeking solutions by self-discovering, inventing and innovating.

Conclusion

BUP's qualitative and quantitative higher education through holism and fusion gets glocal synergy. Hesiod, Valmiki, Vyasa, Homer and others became polymaths using local epistemological colours on global canvas. Macro-development through holistic academics entails BUP's 94 higher education programs at 8 faculties/centres and 56 affiliated institutes. Various -logy, -ics, -graphy, -ism, -sophy and -cracy jointly prescribe *democracy* for human lasting peace. Fight or flight against demons, rivals, animals, diseases and calamities gave gradual wisdom to *Homo Sapiens* to survive and sustain collectively as rational-knowledge animal that BUP profess like Taxila-Nalanda.

Building a Better Bangladesh: The Power of Youth as Changemakers

Major Md. Sabir Ahmed (Retd)
Deputy Registrar
Registrar Office (Academic Section)

Introduction

In South Asia, Bangladesh, a lively and dynamic country, is on the verge of transformational growth and development. The youth of the country hold the unrealized potential at the centre of this revolution. The backbone of any community is youth, which is described as the age range of 15 to 29 years. Youth is a stage of life marked by vigour, aspiration and the need to make a difference. It's a time when people's emotions are passionate and their minds are inquisitive. Progress, inclusivity and sustainable development are at the centre of the young generation's hopes and aspirations. The youth have the power to lead the way for change by helping to create programs and policies that promote equitable development. Their distinctive viewpoints may advocate for sustainable practices, inspire social innovation and question conventional wisdom, paving the path for a society that is more vibrant and inclusive. They picture a Bangladesh where everyone has access to education, where job possibilities are plentiful and where social equality is valued.

As we go into the twenty-first century, it is clear that in Bangladesh youth play a crucial role as change agents in moving the country toward inclusive and sustainable development. It's essential for fostering a prosperous and forward-thinking country to provide the younger generation with the appropriate resources and chances. An in-depth discussion of the vital role that young people in Bangladesh play in the country's development is provided in this article, which also identifies the major areas where their potential can be used to create a better future.

Youths in Liberation War

The contribution of the youths from the language movement to the liberation war of Bangladesh is undeniable. This young class jumped into the liberation war to make Bangladesh independent. Their involvement further accelerated the movement. They also played a key role in extricating Bangladesh from the shackles of subjugation. Youths are playing a significant role in all the unprecedented achievements of Bangladesh. So, change is happening in the state and society through their hands. When Bangladesh is determined to become one of the largest economies in the world, the youths are working as the main force in realising this dream and expectation.

Youth's Role Based on Demographic Diversification.

Bangladesh is currently experiencing a demographic dividend, which refers to a period of favourable demographic conditions that can boost economic growth and development. At present, the rate of population growth is 1.22%.[1] The working-age population, which constitutes approximately 68% of the total population aged between 15 and 64 years, surpasses the number of dependents. This favourable situation presents a crucial opportunity for Bangladesh to leverage its youths and drive economic growth. By actively involving these youths in productive socio-economic activities, the country can fully capitalize on the demographic dividend and reap its benefits.

Our youth have diverse aspirations. It is necessary to see how society is organized to fulfil their aspirations. One thing is that youth will take society forward. Another issue is how society and the state have prepared themselves to receive the young population.[2] We have to provide the appropriate opportunity for youth to develop their capacity. Employment is an important issue for youth. They have to be made functional, but our country lacks such plans. It is true that the literacy rate in Bangladesh has increased to an appreciable level, although this achievement has not reduced the country's unemployment rate much. The main reason is that our education system has not been developed according to the country's needs. There should be a national plan so that a student finds work after graduation. Vocational education plans will help provide the youth with the necessary training and employment.[3]

Youths in Innovation and Technology Advancement

They are a driving force for economic growth due to their curiosity about new possibilities and technical expertise. The public and private sectors can tap into young people's potential to launch startups and businesses that boost the country's economy by funding technological education and supporting an entrepreneurial environment. Young minds can be empowered to use technology for sustainable development through initiatives like incubators, accelerators, and skill development programs. Technical education can be crucial in equipping youth with the necessary skills to thrive in a competitive market. This education system is effective and up-to-date and complements general education. That is why educationally advanced countries prioritize technical education. To transform Bangladesh into a developed nation, it is imperative to enhance youth generations' innovative capabilities by harnessing science and technology's full potential. In this regard, improving the quality of technical education is essential as it enables the country's vast population to become skilled human resources and drive development. If we want to prepare the young generation for the future, education should be paramount. A skilled and working population will be created when the youth can acquire digital knowledge, skills and other necessary knowledge. They will help to continue the progress of the country later. Long-term planning is essential in this regard.[4]

Youths in fulfilling the Sustainable Development Goals

Achieving the Sustainable Development Goals (SDG) requires ensuring maximum utilization of this youth population. Public and private partners must work together to develop the youth population as skilled human resources and create employment opportunities.[5] Our main aim should be to create employment for the youth. However, the future of the youth and the overall development of Bangladesh

depends on how much that goal will be achieved in how much time. We will not be able to utilize the youth unless we prepare them and provide them with suitable jobs according to their needs. If we cannot provide proper employment to this huge youth population, then it will not only hinder the country's development but also demoralize the youth. It is absurd that the country's educated youth will not get jobs and skilled workers should be brought from abroad to run the industry, trade and commerce.[6]

Youths as the Keepers of Cultural Heritage

A strong national identity can only be maintained by preserving and fostering cultural assets. By accepting, celebrating and integrating their rich legacy into contemporary society, Bangladeshi youth can serve as cultural ambassadors. The youth can preserve the nation's traditions and establish platforms to share them with the world through art, music, literature and cultural events. This cultural interchange can advance travel, advance world relations and strengthen the country's soft power.

Actively Participating in Governance and Policymaking

Bangladesh's youth population is sizable, and it is essential that they actively participate in governance and policy-making processes. The government may make sure that the views of the young are heard, and their ideas are taken into consideration by fostering youth participation in politics and decision-making at various levels. A more responsive and effective set of policies that take into account the interests and ambitions of the entire population can result from this inclusiveness.

Field of Development in Bangladesh

Economic Development: With a concentration on industries like textiles and apparel, agriculture, and remittances from migrant workers, Bangladesh has seen consistent economic growth throughout the years. For ongoing development, it is essential to maintain and diversify this growth. Youth can contribute by joining advisory committees or councils, ensuring their perspectives are considered in policy discussions. In economic development, young entrepreneurs can innovate in emerging industries, diversifying the economic landscape.

Development of infrastructure: Bangladesh is investing in initiatives to build roads, bridges, ports, and power plants to boost economic growth and improve quality of life. Empowering Bangladesh's youth to actively engage in governance and development involves fostering their participation in key sectors. In infrastructure, youth engagement in community projects and advocacy for sustainable development is crucial.

Education and skill development: To give the next generation the knowledge and skills they need to effectively contribute to the development of the country, the education system must be improved. Skill development programs must also be promoted. Our youths can actively participate in educational initiatives, promoting skill development programs, and advocating for quality education.

Healthcare: Improving access to medical services and healthcare facilities is essential for raising the nation's overall public health and wellbeing. Youth-led campaigns can raise awareness about healthcare that would be helpful for enhancing healthcare services of Bangladesh.

Renewable Energy: Putting a focus on the use of renewable energy sources can help reduce reliance on fossil fuels, lessen negative environmental effects, and guarantee energy security. Youths are the key influential actors in encouraging sustainable practices and influencing policy decisions for a more inclusive and progressive Bangladesh.

Scope of Improvements

In the near future, today's youth will be responsible for all aspects of the state and society. If their intelligence and talent are not nurtured, they may not just become unfit citizens, but also a section of them may go astray. We can expect from the youth only when all cooperation can be ensured to develop them as good citizens. One cannot expect much from someone without giving something. Qualified youth is the greatest asset of the nation.[7] They are the driving force behind innovation, progress, and social transformation. If they can be developed at the right time and in the right way, they will act as the catalyst for changing society and the state.

Challenges to Development in Bangladesh and Youth's Role in Overcoming the Challenges.

Population Growth: Bangladesh faces the challenge of a rapidly growing population, which puts pressure on resources, infrastructure and the job market. Youth in Bangladesh can play a pivotal role in overcoming development challenges. Through education and awareness campaigns, they can contribute to sustainable population control measures.

Poverty and Inequality: Poverty remains a significant concern, with a substantial portion of the population living below the poverty line. Addressing income inequality and providing social safety nets are crucial in promoting inclusive development. Engaging in community initiatives, young people can address poverty by promoting skill development and entrepreneurship.

Climate Change: As a climate-vulnerable country, Bangladesh is susceptible to natural disasters like cyclones, floods, and rising sea levels. Mitigating the impacts of climate change and promoting resilience are critical challenges. In combating climate change, youth-led environmental movements can advocate for sustainable practices and contribute to resilience-building efforts.

Governance and Corruption: Ensuring effective governance and combating corruption are essential for efficient use of resources and the successful implementation of development projects. The younger generation can also actively participate in governance processes, demanding transparency and accountability to combat corruption. Empowering and involving the youth ensures a dynamic force in finding innovative solutions and fostering inclusive, sustainable development in Bangladesh.

Conclusion

In conclusion, the role of youths as changemakers for the national development of Bangladesh is indispensable. Their visionary leadership, entrepreneurship, social activism, technological prowess, focus on education and skill development, political engagement, and cultural preservation contribute to building a prosperous and inclusive nation.

Their enthusiasm, ingenuity, and commitment will mold the country's future. Bangladesh can harness the potential of its youth by giving them with education, opportunity and a nurturing environment, paving the path for a thriving, sustainable and inclusive society. It is the obligation of the government, the commercial sector, educational institutions, and society at large to invest in and empower the youth in order for them to become the leaders and innovators who will propel the country forward. Bangladesh can construct a brighter and more promising future as a unified force, with its youth leading the way.

By harnessing their energy, ideas, and talents, Bangladesh can embrace sustainable development, address challenges and create a brighter future for all its citizens. It is essential to empower and provide opportunities for youths to actively participate in shaping the destiny of their nation, as they hold the potential to be the catalysts for positive change and the driving force behind Bangladesh's progress.

References:

[1]Population and Housing Census 2022, Preliminary Report, BBS, GoB

[2]H. Z. Rahman, Bonikbarta, 05 Jun 2023.

[3]AKM Atikur Rahman, Newsbangla24.com, 06 February 2021.

[4]Yuing Karl, Dily Jugantar, 03 November 2021.

[5]Daily Prothom-Alo, 21 December 2022.

[6]Protidinersangbad, 04 May 2023.

[7]S A Maksud, Daily Prothom-Alo, 08 November 2016.

Public Administration in the Age of Fourth Industrial Revolution

Mohammad Nur Ullah
Assistant Professor
Department of Public Administration

The Fourth Industrial Revolution (4IR) integrates the physical, digital, and biological worlds through significant Technological Advancements (TA) for daily tasks. The World Economic Forum (WEF) founder and executive chairman Klaus Schwab launched the term "4th Industrial Revolution" in his 2016 book, "The Fourth Industrial Revolution", making him the father of the 4IR. Schwab coined the phrase to describe recent and upcoming TA expected to change our lives and work. The Revolution brought the development of artificial intelligence (AI), robotics, the Internet of Things (IoT), big data analytics, and service automation to replace outdated methods. In Klaus Schwab's opinion, the 4IR is a "supply-side miracle" resulting in significant economic growth and development by reaching long-term productivity at lower prices. It is a chance for everyone to leverage convergent technologies to create a more open and human-centered future, including leaders, policy-makers, and people from all socioeconomic levels and nations.[1]

The 4IR significantly affects public administration, like many other sectors in a country, as they consider 4IR's possibilities and potential while formulating government policies. The potential effects are examined from various angles; a) the citizenry is the most crucial component of every public administration system. During this worldwide transformation, problems like the digital divide will have disastrous effects because 4IR-bound technologies are on the path to assimilation. According to Schwab (2016)[2], citizens using the 4IR will have their identification and ownership patterns altered. These will affect the populace's interactions, social relationships, and activities; b) as previously noted, current policymaking practices are on the verge of fundamental transformation because the government and the public authorities are moving in the same direction. A difficulty for the public administration is about to arise. The government system will survive if it can demonstrate that it can adjust to a world of disruptive change. If not, the government will face significant risks for survival; c) a crucial area of worry for public administration is how 4IR and its revolutionary process may affect politics.[1] According to the research done by Rumi et al. (2020)[3], the 4IR also suggests some changes to political systems. Therefore, it is ideal that voting patterns, election-related violence, and political party manifestos are in the process of changing. The research points to 4IR as a new paradigm for administration: "Future Digital E-Governance", where digital platforms will be used for election campaigning and intelligent voting systems will be used; d) only a few

researchers have evaluated 4IR and its effects on the government. However, it is difficult to find many different types of literature on the topic alone, suggesting that the contextual governance mechanism will be simple pickings for 4IR. Government can take one of two positions[2]. First, in line with Schwab's (2016) writings, 4IR and its modernized technologies will provide the government with new technological powers and enable it to exert greater control over the populace. The second viewpoint also suggests that this 4IR will undoubtedly be a nightmare regarding governance and control. Technology will let people experiment with novel e-participation and e-accountability methods. Social media or other related platforms will impact public opinion trends and expectations for delivering public services. Due to these alternating nodes, the government will be under pressure to adapt how it approaches public works and policymaking. Paunova (2016)[4] noted that the government's ability to make policy would gradually decline due to new sources of competition in the public sector and practices for power decentralization allowed by technology; e) Changes in the dynamics of citizen expectations and demand, workforce transformation brought about by automation, which affects public sector jobs and necessitates the acquisition of modern data-driven skills for survival, disruption of traditional administrative service processes, and management of digital transformation within public institutions, all of which call for data-driven decision-making; A costly public administration is a result of the rise of cyber security. Therefore, it follows that the 4IR will start yet another paradigm changes in the field of public administration, "*4IR: From New Public Service to the Future E-Governance*".

If we discuss the future of public administration, one of the unresolved research concerns is whether or not public administration may choose to pursue or is prepared to embrace the 4IR. This concern leads to the conclusion that the government can adopt 4IR because it promises increased productivity and efficiency in public service. It claims that disorder is unavoidable but that the public administration must take a comprehensive approach in response to the question of preparation and the dehumanization debates. Third World nations may adapt more slowly due to inadequate people and material resources. A cooperative strategy was used to close the technology gap between industrialized and developing nations, where governments will take their time implementing cutting-edge 4IR technologies. A comprehensive manual that frames the 4IR adaption milestones and tactics might be created.

To meet the issues posed by 4IR, it is crucial to recognize that the state is dynamic and apply this understanding to state affairs. By doing so, the state will be better able to adjust to technological advancements. Guidelines, codes, and standards might be established to guarantee technology integration and human decency, upholding public confidence and safety, particularly in the cyber world. Additionally, policy actions must be taken, such as establishing cyber security frameworks, e-literacy and skills development programs, promoting public-private partnerships (PPP)[5], fostering knowledge sharing and collaboration among public officials, and promoting collaborative governance and citizen engagement. In order to effectively utilize the 4IR's potential, governments

worldwide should take proactive action and develop a more effective, inclusive, and responsive governance system for the benefit of society as a whole.

Reference:

[1]Schwab, K. 2016. The Fourth Industrial Revolution, the World Economic Forum. Available at: http://www.weforum.org/pages/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab. Accessed 19 June 2023.

[2]Ibid

[3]Rumi MH, Rashid MH, Makhdum N, and Nahid NU. (2020). Fourth industrial revolution in Bangladesh: prospects and challenges, Asian J. Soc. Sci. Leg. Stud., 2(5), 104-114.

[4]Paunova, E. 2016. The Global Platform: Launching the fourth industrial revolution. World Commerce Review, 10(1):12–15.

[5]Public Private Partnership refers a collaboration between government and private entities to provide public services smoothly.

Making the Most out of BUP Life

Rahat Ahmed Shimanto
Student
Department of Business Administration in Marketing

University life is one like no other. After months of struggle and perseverance, you finally find yourself stepping into a new chapter of life wondering what it will be like being here at this university for the next few years. As you remain engulfed with thoughts of uncertainties brewing in your mind, soon you find yourself in a room among a bunch of individuals who are all strangers and have earned their place here, just like you. Little do you know that you are stepping into a beautiful journey of life with these very people and about to create memories that you will cherish forever. These very strangers will turn out to be the most incredible human beings and an integral part of your life. And by the time you realize how this uncertain life of university is actually a wholesome one, you will find as if the years have gone by in a flash. Such is the uncertainty and beauty of university life. So, as a student, you would surely not want to miss out on making the most out of the incredible years of university.

University life opens the door to numerous opportunities to steer your life and career forward. Hence, it can be considered a defining phase of your life. So, as you go on to study with talented individuals with versatile calibre from different backgrounds, you will want to take your shot at the diverse opportunities and experiences that appear before you all. To facilitate your aspirations for enjoying the university life to the fullest and in a meaningful way, I would like to share my two cents from my beautiful time at Bangladesh University of Professionals (BUP).

To begin with, before getting into university, one of the things that highly attracted me was seeing people from different universities achieving remarkable accolades at national and international competitions and representing their institution and country at national and international levels. I would dream of myself being on similar stages when I get into university as well. By the grace of Almighty Allah, I got into the marketing department at BUP and few months into here, I tested myself with a few friends from my class in an intra-BUP business case competition titled "Finatrics." Though I did not know much about crafting the best solution, I ended up making a silly error of naming the submission file as "Case Study Solution" instead of my team's name. That was my condition at the beginning. Although we did not progress in that competition, I would still dream of winning one always. So, that competition outcome gave me a daunting experience and frights of how tough competitions might be. But little did I know that it was all about constantly trying and putting in better effort each time. Because that is what matters ultimately, the learnings and experiences you

gain from each opportunity and how they transform you. So, fast forward to my final year of BBA and then getting into my MBA stint at BUP, I have had multiple national and international accolades to my name in academics and extra-curriculars like academic scholarships, publications, business competitions, Olympiads, and even achieving a national award from the Honourable Prime Minister and thereby representing my university proudly.

If you are currently a student at BUP, start utilizing your social networks sensibly. Get added to Facebook groups like Business Competition Information, Opportunity Hub, etc., where various opportunities for students are posted regularly. Then, follow the social media pages of different university clubs and leading organizations to know about prestigious competitions, workshops, and other opportunities and lastly, create and update your LinkedIn profile to stay connected with the professional world. Also, regularly check platforms like Youth Opportunities, government ministries, and institutions to stay updated on events at national and international levels. If you are an avid opportunity and resource seeker, do check out previous edition resources of various competitions on SlideShare and YouTube. These are all goldmines for you to learn from for the next few years at university. It does not matter if you are a student from business, social science, or any other discipline or department, there are opportunities for everyone. From Business to Policy-making competitions, Debating, Sports, and Olympiads, the list goes on. So, whether it is your first or multiple number attempt, do not lose faith. Even if you face setbacks, never stop trying to improve yourself and be aware of the latest trends and transformations happening across various sectors to sharpen your acumen, and do not hesitate to reach out for insightful suggestions and feedback from your seniors, faculties, and even your juniors, because every feedback counts. Additionally, do enjoy the greenery of your campus and its safe and secured environment, participate in club events, fests, and workshops, develop your research, technical, and soft skills, enrol into extra skill-building courses from leading platforms like Coursera, edX, Google, and collaborate with faculties to learn and publish research projects as well. All of these will only make your experiences more fulfilling and elevate you over the years. Lastly, while you attempt at these activities, do maintain a healthy balance of your academic performance, refrain from any malicious activities or influence, and be respectful towards the disciplinary guidelines. So, by devoting to all these activities, you will have a journey to be grateful for as you head towards graduation. And who knows, you might be the next one here narrating your incredible story for the current and next bunch of students at BUP. My time at Bangladesh University of Professionals (BUP) has been incredible. And I wish that yours go even better. To the ones reading this, make your BUP life a beautiful one. One that you would be happy and proud of. Wishing you all the very best for a wonderful BUP life!

An Unpaid Debt: Gratitude for Lifetime

Jannateen Naoar Siena
Student
Department of Public Administration

Unconsciously, a girl broke a glass and was about to clean the shards of the broken glass. Suddenly, someone told to stop her saying, ‘don’t touch it, I will do it.’ This voice is so known to her. She knows that lovely lady whose lap is a place of peace for her. In the time of going out if she forgets to take the umbrella, there is always a man who walks with her holding an umbrella in hand just to protect her from the rays of the sun. Whenever she is late coming to home, she gets phone calls. If she gets a fever, she finds them anxious and distressed. The time when she gets appreciation, whether it is for academics or not, she finds them so happy.

Can you even guess who are they?

Who are here in this world to think this much or to do such things for someone?

--- They are none other than our ‘parents.’

The girl found her parents beside her all the time. Dropping to school, taking back from school. She got help from her mother for doing her regular homework on time, getting her necessary things, etc., and every responsibility has always been performed well. They didn’t even differentiate between their daughter and son. But too some extent the girl felt like - her parents loved her more than anything, anyone existing in this world. On the days of her coaching classes, the girl found her father standing outside for taking her home. From her childhood to today, she found her mother as a friend; that one friend with whom she has shared a lot of thoughts, insights, and everything she wanted to share, and she knew that this friend would never betray her. The level of ‘believe’ is not measurable by any means.

During her admission test period, she was worried and depressed. Both of her parents gave her mental support despite so many unwanted words coming from relatives and others. This kind of support these days is poorly needed to save the children from taking suicidal attempts. One day, that girl expressed her interest in going on a trip with her friends. Despite having this much support from her parents, she got a negative answer this time. That one day, she felt too hurt and asked herself why they were not willing to permit her. This made her sad as this type of trip never comes to life on a daily basis. But later, she has found the answer. She realized that sometimes, it is parents’ love for their children, which always want them to be protected at any cost. Some of her known persons have lost their

parents - some of them have lost their father or mother, and some others have lost both of them. So, the pain of losing the love, care and shadow of parents is unbearable. The girl thinks of herself as the luckiest one on earth who has the shade of her parents in every sphere of her life.

There is a verse in the Quran, that is - “Every soul shall have the taste of death”, mentioned in Surah Al Imran: 185. This is the reality of life. No one is meant to be alive for a lifetime. Now, it’s been Ten years since she lost her parents. She, herself, is now a mother of a girl child. The moment she hears her daughter calling her as - ‘Mother’, or calling her father, it touches her heart. She strongly feels the hollowness inside her. The cruel reality is - ‘No one can love you selflessly, unconditionally except your parents!’

We often have arguments with our parents. Even if they say something good for us, we think they are not getting us, they do not even understand us. But it needs to be kept in mind that they are also humans. If they say something that is not the right one, we have that responsibility to show them the right thing by giving them the respect they deserve. The people living without the hands of their parents over the head, know how hard and deepest the feeling is. If you have your parents with you, if you still receive their phone calls, if you can call them as - ‘Mother’, ‘Father’, and also can receive their response from the other side, if you are still watching them in front of your eyes - talking to you, scolding you, caring you, then believe me you are the luckiest and blessed one here in this eternity.

‘Father’ & ‘Mother’, these words are not just words only. There stays emotion, and connection of blood and heart. Let us try to have some time for them. We would find money if we lost it. But we would not be able to find them if anyone or both get lost from our lives. Therefore, we have to be grateful to them forever because it is impossible to repay the debt of their sacrifices that are being done for us!

Reference:

https://pixers.uk/wall-murals/baby-s-hand-inside-parent-s-hands-38434547

Ripples of Resilience: The Elegy of Female Role Models in Young Minds

Anika Meher Amin
Student
Department of Business Administration in Marketing

Who's your role model? Which woman would you idolize in your life? Back in the day, I think most of us would answer this question with one answer, one person. It would either be our mothers, the first female astronaut, a female Nobel Laureate or a famous actress. But growing up, I realised how it's never limited to one person, it's a bunch of graceful ladies in our lives, impacting how we think.

Of course, role models, regardless of their gender, always hold a special place. However, I would like to take a moment to appreciate all the women playing various roles, in shaping young girls' lives and minds, something closer to our hearts, broader than gender roles. You see, growing up in an ever-changing world, young minds are shaped in various ways. I want to highlight the types of female role models I have seen around me or my peers. South Asian countries and the deeply embedded net of Brown culture have piled on various expectations on the female population. Having to balance between cultural traditions and modern outlooks as well. Subtly referring to pop culture and the recently released, "Barbie" movie, it's expected from women to be an all-rounder. Women have to be everything, everywhere, all at once, but at the end of the day, they are all humans trying their best. You can't be too soft but you can't be too mean, you have to be ambitious, yet you have to be family-oriented, you have to look pretty but you can't dress up too much either and honestly, the list goes on and on.

Over time, many women have played roles in shaping who we are and our personalities. Let's have a walk down memory lane and see how many of these examples we can relate to.

Of course, the first woman would be our moms, whether she was a busy working woman or a stay-at-home mother, she plays the most significant role in moulding us. She guided us from the earliest stepping stones of life and teaches us to be kind, patient, ambitious, and strong. They teach us to handle ourselves, our homes and our work. Most mothers, I believe, are the ones who help their daughters find their true selves the most.

Now, let's have a look at some other examples that you may, or may not relate to. You see, not everyone will have a huge impact on your life, it might be quite bijou.

It might be that one tutor you had in 9th grade. She was quite simple, teaching you

the basics of your subjects. Yet, she shares this random incident about how she raised her voice against harassment and cat-calling. She might not have intended to hand you an epiphany, but yet, your young teenage mind grips onto that story. You have faced such situations before, but maybe you never really thought you could raise your voice against it. Not every brown household teaches us to be that vocal, this time you gained a new perspective. She showed you a way to stand up for yourself, keeping your head held high. That tutor was merely being friendly and kind to you, yet she taught you so much. Unbeknown to her, she shaped a huge part of your personality.

While every other woman in the previous generations of your family had to stay home, taking care of the family, not that it's a bad thing, one woman breaks the stereotype. One aunt decides to marry late and choose her career. She goes ahead, moves abroad and earns a PhD. The very first in your family. Your 16-year-old self is mesmerized, "I want that life too!" you think to yourself. Years later, you are on your own to get a second master's degree and maybe thinking of a doctorate as well.

Now, let's talk about the women who taught us to be kind and warm and to be the glue of our families. That one aunt who taught you how to cook gave you her secret recipe for your favourite dish. While another one had this huge collection of books, you would go to her place and spend your entire day diving your nose into these books, having your escape to the world of fiction and stories. Maybe another one of your very modern aunts will also teach you some religious acts, some old traditions, some long-forgotten cultures, she learnt from her mom. That one cousin, who chose to put her family first and take care of her parents, then eventually her kids, all while working from home and earning her own money as well.

Role models are not limited to only people older than us, some are also our peers, our juniors. That one friend, taught us the modern integrities of life, introducing us to pop culture, to the world of fiction, while another friend taught us the basics of makeup and dressing up. One helped you through a bad breakup and another one helped you figure out your career goals.

Before you know it, you are someone else's role model as well. Maybe your younger ones won't say it but you do have an impact in their lives as well. You see, what I'm trying to say is that young minds are mouldable and it's quite difficult to keep up with the fast pace of life. Yes, society dumps many expectations on us, we are caught up in this whirlpool of hustle culture, trying to keep up. But life has its ways of helping us as well, just like all these women helped shape who you are, be that guiding light in another girl's life. Women, regardless of their conventional duties, can be so much more, and our minds are a concoction of what we learn from these women and our own battles in life. We don't realize how much of an impact one act of kindness and help can do. Cheers to all the women, making the world a better place.

Digital Addiction and the Changing Pattern of Family Relationships

Jannatul Ferdous Ety
Student
Department of Sociology

The little girl Fatima is lying next to her grandmother on the verandah in the evening. Grandma is telling stories of kings, queens or fairies, and Fatima is falling asleep while listening to the story. During the summer holidays, cousins sit on the rooftops in the evenings, playing ludo, gossiping, or watching movies on television with all family members. These beautiful scenes of the family are not seen now a days. Family relationships are changing due to technological advancement and digital addiction.

Technology has made tremendous and unimaginable progress in Bangladesh. Very few houses can be found in the country where technology is not being used. There is no place in the village and town, starting from slums, where computers, internet, smartphones etc. are not being used. Undoubtedly, this unprecedented development of technology has made our lives easier and more dynamic. However, this development of technology is affecting our family relationships in many ways. It has a significant impact on family interactions since it reduces family time and face-to-face communication. The ways in which families interact are changing due to technological improvements.[1]

Advanced digital media and devices are influential factors changing our way of engagement with the outer world and the closest people in our family. In earlier days, when there was no access to these digital devices, there was a close bond among family members. Relatives maintained good relations with parents, siblings, uncles, aunts, grandparents, and others in the family. Everyone shared their joys and sorrows. In the danger of one, the other would stand beside him. But the development of information technology has mechanized us by taking away our subtle instincts, especially human values. The present generation has become so intoxicated with technology that even if there are sick patients at home or in the family, they do not have time to take care of them. Family ties have become much lighter now a days.

Digital media is creating a divide in the family. There are clear reasons for this division. When children are immersed in technology, from texting to video games, they do not have time to talk to their parents. On the other hand, parents are engrossed in their technological lives rather than interacting with their children. As a result, both parents and children lead separate lives as they waste an important part of their time on these devices. Parents spending more time on digital devices like phones, the internet

or television during family activities such as meals, playtime, and bedtime could affect long-term relationships with children.[2] Technology addiction is changing the way parents treat their children. It is hampering the parent-child behavioural pattern and decreasing family communication.

This technology is also increasing the division between husband and wife. When they return home at the end of the day, they rarely talk. Lying in the same bed, the two of them got busy on the screen of their respective phones. Searching for the cause of marital discord, one-third found their partner to be overlooked and suspicious of excessive mobile phone use. Husbands and wives need to spend time together to maintain a good relationship. It is not happening because of mobile. Excessive use of mobile phones threatens marital relationships.[3]

Family, as a whole, is significantly affected by the uncontrolled use of digital media. Due to this digital addiction, no one usually goes out with family members and does not talk to each other. Man-to-man communication is now happening through devices rather than directly, as before. Due to the overwhelming addiction to digital technology, we now feel comfortable communicating virtually. However, many of us are floating in false fascination. We also confuse the difference between true friends and acquaintances in virtual communication. This results in increasing distance from family members. The virtual medium of communication isolates people from family and society. The depth of the relationship is not lasting. Divorce is happening, and the relationship is deteriorating.

We must discipline our daily lives to avoid digital addiction and its negative consequences. The use of digital devices should be limited and controlled. We should not be controlled by the devices. The younger members of the family should be given quality time. Need to talk, play or hang out with them. A small library can be built at home. Parents should read their own books and encourage their children to read books. Family members can spend their free time playing carom, ludo, chess, etc., at home together. Family picnics or get together can be organized occasionally, which will increase interaction among the family members. After all, to avoid digital addiction and its evils, we need to make ourselves and other family members aware of using digital devices.

Reference:

[1]UKEssays. (November 2018). Negative Impact of Technology on Family Dynamics. Retrieved from https://www.ukessays.com/essays/family/negative-impact-of-technology-on-family-dynamics.php?vref=1

[2]Springer. (2018, June 13). Digital devices during family time could exacerbate bad behaviour: ScienceDaily. Retrieved from www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180613102022.htm.

[3]Daily Jugantar, 28 July 2019. Retrieved from https://www.jugantor.com/lifestyle/204358/মোবাইল-ফোনের-কারণে-বাড়ছে-দাম্পত্য-কলহ-গবেষণা/

Caged

Azharul Islam
Student
Department of International Relations

“A caged bird escaping its cage,” the master spoke up suddenly. “You called that freedom, didn’t you?” “Yes, I did,” said the apprentice.

He was putting in the finishing touches of his painting. He and his master were having a sort of ‘art-duel’, as they did quite often on the weekends. They sat at either side of the table with canvases to their faces, painting the apprentice had never won against his master. Today’s topic was “Freedom”

“But the bird only ends up in a bigger cage,” said the master. “You can’t really call that true freedom, can you?”

“Then it’s the same for all of us”, the apprentice replied. All creatures are caged in this universe and the universe is only an abysmally, unfathomably large cage, even if we do find a way to traverse it.”

“My point exactly,” the master smiled his usual smile as if he had known something his apprentice hadn’t “So, leaving its cage isn’t freedom because it’s still limited by space. Then where is it that we don’t face any limitations? Where is it that we are truly free?”

The master paused.

“Well,” the apprentice took the hint. “where?”

“In our minds,” the master said. “Think about it. Is there anything restricting your thoughts? No, you’re free to come up with an idea and expand upon it as you wish. That is how the best arts and literature came to be. Someone saw a lizard and came up with dragons!”

The apprentice only nodded. He’d never thought of it this way. Maybe that was the difference between him and his master.

“But, then again,” the master continued “One must ask why most art and literature, apart from the best of the bests seem so bland, if they truly did have total freedom?”

The apprentice knew the answer. But he dared not say it, for he had committed the same sin just now “It’s because the human mind is filled with ideas from other people from the moment it gains consciousness,” the master said. “We are never actually allowed to think on something by ourselves, everything is pre-determined for us. Everyone else fills our heads with prejudices even before we begin to think, rendering us unable to even form an original thought. Caging our minds in this way kills our creative potential.”

“So, original thoughts become a rare delicacy,” the apprentice said. “And the caged minds relish in what they cannot create. Am I right?”

“Yes,” the master agreed. “Van Gogh and Picasso are so well loved just because of this. They had freed their minds from what others taught them. Enough of this now, let’s look at your picture.”

The apprentice turned his canvas around. He had painted a little bird escaping from a cage in the bottom left corner. It flew diagonally upwards and faded into the sky. Icaruss and Daedalus continued flying in the bird’s trajectory. In the middle of the canvas Daedalus hovered over where Icarus had fallen into the sea, weeping. Two men stood at the beach watching humanist’s first aircraft taking flight. At the upper left corner, the sky faded into a dark, a dark, starry space A spacecraft touched only the edge of the space.

The master’s face remained unchanged-only a faint smile suggesting he knew he was the wiser one. “Hmm, yes,” the master examined the picture. “Caged bird.....Icarus and Daedalus.... The Wright brothers and the first aircraft.....humanity’s miniscule knowledge of the vast galaxies.... You just have covered everything in one picture. And your flowy painting style makes up for the common concept. But you’ve not freed your mind from what other’s filled it with.

As I said, you’ve been taught that freedom is not escaping a cage into an even bigger one and you never questioned it. You let them cage in your mind-the only rightly free part of yours.”

“I understand,” the apprentice said. “Show me your picture now”

The master turned his canvas around, and the moment the apprentice lay eyes on what his master had painted he knew he’d lost.

Colors flowed outwards from a single little white dot in the centre in a pattern that reminded one of a tie-dye design. The little white dot must’ve symbolized the human brain as all thoughts converged there and all colors converged to make white. The rivers of different colors symbolized different ideas and thoughts of the free brain and they looked if they flowed out of the canvas. That gave the impression that they were not bound by anything but was truly uncared.

Then the apprentice realized what his master had meant. He’d thrown away every prejudice about freedom and came up with a view of his own. He had been free in printing his picture and expressing his idea.

“I sometimes think it a cruel jape that the Creator left us with an infinite instrument in a finite cage”

Acquaintance

Tasnim Naz
Lecturer
Department of English

As I stood in front of my mother's old creaky closet, a wave of hotchpotch sensations washed over me. Pervading them all was mostly confusion. My mother's closet was a mismatched circus - of oversized sweaters, worn out sarees, and singular pieces of kameez. What struck me was how disorganized it was, how uncared for. Growing up, I remembered a motley of memories of my mother cleaning, dusting and organizing. I remember her entering my room to organize my disheveled closet, which left me with utter disdain and general annoyance. I had convinced myself that I would get around to organizing the closet myself - even though I never really got around to it. I recalled experiencing a lump in my throat every time I watched my closet being organized, as if I was incapable and my mother had breached my guarded privacy.

I handled each clothing item of my mother with as much care as I could muster. I wanted to organize them in a somewhat cohesive manner, even though they all seemed like an unsquared jigsaw puzzle. As I took out all my mother's clothing and dumped them onto the bed, a few of them surprisingly caught my fancy. I tried on a gray sweater that barely fit me, and I took a deep whiff. It smelled of some cheap old perfume and naphthalene. I tried conjuring up the memory of my mother wearing that gray sweater, but no such memory crossed my mind. Every vision I saw of her was in a hazy saree, nothing in colour, nothing that stands out - or maybe I just hadn't paid much attention. I took a picture of myself in that dusty grey sweater on a worn-out mirror and sent it to my husband. He wrote back that I looked a lot like my mother and that I should keep the sweater. But I decided against it. At the end of the day, I don't need the sweater - but someone in need definitely does. I put my mother's lifetime worth of clothing into clear plastic bags, and piled them all up in bed.

I went to the kitchen to look for teabags and I found some on the dusty corner shelves. One of my mother's mugs had no handle on it, and the coating had faded away with time. I smirked a little, 'she always did have a hard time letting things go.' I sipped my dried-out tea and looked through my mother's drawers. It felt like an invasion, something I would never dream of doing growing up with my mother. But something told me she wouldn't mind. I found a gold pendant which I decided to keep. I wore it around my neck and looked in the mirror. 'Had my mother ever worn this pendant? Had she saved it for special occasions? Or had she worn it to my wedding?' I couldn't say.

I changed my mind and went over to the plastic bags which held my mother's clothes. The gray sweater lay at the bottom of the pile, and I pulled it out and put it on. The sweater hugged my body - it was itchy, and comforting, cold but also warm. Going through my mother's drawers I found a diary of Du'as- in handwriting similar to that of a child. I found a diary containing phone numbers, with its faded vanishing blue ink-stained paper. There were cutouts of discount coupons, loose pearls from a necklace, a ketchup packet, and her birth certificate - among other things. The birth certificate mocked me bitterly because of how old it was. I knew I was to hold a shiny new death certificate in a few days time.

As I rummaged through my mother's lost belongings, I found that she loved the colour green, and that she collected 5 taka coins and kept them in a bundle. I found that she never threw out perfume bottles, or diaries. She had an assortment of pins, and she kept her sewing needles and threads in a rusty tin can. I found that she used Pringles containers for storing receipts and bills. My mother still had cassette tapes, despite not owning a cassette player. She had carrots in the fridge that had rotted, and soy-sauce that had expired four months ago.

Every drawer I touched mocked me. Every little nook in my mother's house was her being all out in the open. I never realized that my mother was a whole person - that she had a favourite colour, or a strange addiction. And now, there was no place for her things anymore. Her belongings were the belongings of a ghost. But then, why are they all so alive? The pins, the mugs, the pendant, the perfume bottles, the gray sweater?

I clutched my dead mother's gray sweater and I cried into them. I apologized, I heaved. I got up and washed my mother's tea mug. I took out all her belongings, trying not to think of anything - but the thoughts came, slowly creeping up my skin. I looked around the old apartment for signs of my mother - they were there. I could not scrub it clean off of her. I took out an old page from one of her diaries and wrote in my childlike handwriting-

'Ammu I am sorry. Today I took out all your belongings and I have decided to donate them, because I know how much you love charity. I hope you are happy, wherever you are. And I'm sorry it took me so long to get to know you. But I've gotten to know you today – and I think you're great, I hope you can forgive me.'

The tears came again and I welcomed them. I left the note on the table for my mother to see and I believed with all my heart that somehow, she would see it.

Note: This article was Previously Published in the Daily Star.

Renovating Historical Heritages: Quest for Boosting Tourism in Bangladesh

Helal Uddin
Section Officer
Vice Chancellor's Secretariat

Bangladesh is a country with a rich history and diverse cultural heritage. It is the home to a multitude of ancient sites. Not only these historical monuments, archaeological sites, and cultural landmarks are a testament to the nation's past, but they also have the potential to play a significant role in promoting the tourism industry. Effective tourism development can stimulate economic expansion, employment creation, and cultural exchange. By renovating and preserving its historical heritage, Bangladesh can unleash the full potential of its tourism industry, attracting tourists from around the globe and nurturing a greater appreciation for the nation's unique identity.

The history of Bangladesh dates back several millennia, with ancient civilisations like the Indus Valley and the Maurya Empire having a significant impact on the region. The nation's heritage consists of a vast array of architectural marvels, archaeological treasures, religious sites and cultural landmarks. Among the most notable historical heritage sites, Paharpur Bihar, Mahasthangarh, Sixty Dome Mosque, Mainamati, Kantanagar Temple, Lalbagh Fort, Ahsan Manzil and many others are well known to us. However, there are so many historic archaeological heritages unknown to general people, and some other sites are known but not preserved well, such as Boro Katara and Choto Katara of Old Dhaka, Nagar Kasba of Munshiganj, Darasbari Mosque of Chapainawabganj, Tanknath Palace of Thakurgaon, Mathbari Temple of Satkhira, etc. Many ancient buildings and architecture are getting destroyed due to a lack of renovation. Important structures scattered throughout the country are on the verge of extinction and destruction due to negligence and indifference. Renovating and preserving these historic archaeological heritages has great significance in boosting the tourism industry in Bangladesh.

Darasbari Mosque of Chapainawabganj

Heritage tourism entails tourists searching out destinations that offer a glimpse into the past and the opportunity to investigate cultural and historical significance. This type of tourism has increased in prominence worldwide as millions of travellers seek authentic and enlightening experiences. The significance of heritage tourism rests in the perspectives of today's visitors. People do not want to visit a location merely to sightsee. Tourists of today are motivated by knowledge and experience. They are interested in understanding the significance of a location and its history and partake in local activities and celebrations. Bangladesh possesses all the elements required to become a prominent heritage tourism destination. By renovating and demonstrating its historic sites, Bangladesh can attract a wider variety of tourists, including cultural vultures, religious travellers, and history buffs.

Palace of Tanknath, Thakurgaon

Mathbari Temple, Satkhira

Developing heritage tourism through renovating and preserving historical sites provides a much-needed boost to Bangladesh's economy. Tourism spending on hotels, transportation, food, souvenirs, and local services contributes to the local economy and creates employment opportunities for the residents of the local area. Heritage tourism promotes cultural understanding and exchange between tourists and local communities. This interaction can lead to a greater appreciation for Bangladesh's distinctive culture, traditions, and way of life. Government and local communities can be encouraged to invest in renovating and conservating historic sites for promoting tourism. Tourism can be added to a new dimension if the archaeological sites are made known to the world. Besides, maintenance and restoration efforts will aid in preserving these treasures for future generations.

Heritage tourism in Bangladesh, despite having potential benefits, has some key challenges that need to be addressed to make this vision a reality. The archaeological monuments of the country are still unexplored in terms of tourism. The development of historical tourism requires proper information and research first. In this case, the local community should be involved. If they are involved, the maintenance of historical structures and the safety of tourists will be ensured to a large extent.

Unplanned expansion of tourism has the possibility of damaging and deteriorating the historic sites. These archaeological sites are fragile resources and vulnerable to damage caused by the changes to their surroundings. Tourists and visitors to these sites need to be made aware of the vulnerability of these fragile resources. Moreover, renovation and expansion plans of such archaeological sites should be systematic and verified by the experts.

Many historical sites in Bangladesh are on the verge of destruction due to negligence and a lack of funds for preservation and maintenance. Collaborative efforts of government, non-government, private sector, and international agencies may help in restoring and maintaining these sites. Transportation and communication infrastructures must be developed to facilitate seamless travel to heritage sites. Tourist accessibility can be increased by investing in roads, rails and airports.

Responsible tourism practices are crucial for ensuring sustainable heritage tourism. These practices include promoting eco-friendly tourism, minimising deteriorating impacts on the environment, and respecting local people's cultural norms and traditions. Effective marketing and promotion initiatives are also necessary to attract tourists to the incredible historical sites of Bangladesh. The country's historical treasures can be promoted through innovative digital marketing campaigns, participation in international tourism events, and partnerships with travel agencies.

Archaeological and historical sites play an important role in highlighting the history and heritage of a country. Renovation and preservation of historical heritage will benefit the country's economic growth and cultural preservation, along with promoting the tourism industry. Bangladesh can attract a wider variety of tourists, promote sustainable development, and nurture cultural exchange by capitalising on its rich history and diverse heritage. It can become a destination for prominent heritage tourism through the combined and cooperative efforts of the government, local communities, and international investors, apprehending the imaginations of tourists worldwide and ensuring the protection of its irreplaceable historical resources for future generations.

Before and after Renovation of Sonargaon Baro Sardar Bari, Narayanganj

Gratitude on Your Own Soul

Mst. Fatema Binta Alam Jim
Student
Department of Economics

"You should have expressed gratitude to you", this sentence has been coming to my mind again and again. But I am not finding any reason to be that. Me and inner me are fighting with each other to prove our superiority.

So, our conversation is like,

Inner me: Why don't you express your gratitude for where you belong to?

Me: I don't have any problem with where I belong.

Inner me: Then where is the problem?

Me: But you behave as if you knew every thought of mine. But you don't know this simple matter. That's not expected of you.

Inner me: Staying in confusion may be the peace at the nightmare dress.

Me: Ok, I am impressed by you. The problem arises when I don't get what I deserve.

Inner me: Are you sure?

Me: Why don't I?

Inner me: You have got everything that you have deserved.

Me: How!

Inner me: You have given your best. Your effort is yours. It defines you.

Me: But I didn't get the best. I am adjusting to the situation.

Inner me: But you are making an effort to be adjusted.

Me: Nothing is extraordinary here. I am still an ordinary who can't change anything.

Inner me: You have two options with your life. Leave it or live it. But you are living your life. So, you are extraordinary here.

Me: How am I living my life?

Inner me: Every day you think about yourself and especially about your effort

Me: Nothing is changed.

Inner me: But you believe that It's ok not to be ok, don't you?

Me: Yeap.

Me: You win.

I should express gratitude to myself because my effort is mine.

Thanks to me for not just surviving but for allowing me to live my life.

My Mind is a Dark Void

Tasneem Azim
Student
Department of Economics

Tap.
Tap tap.
Tap tap tap.
"Who's it?"
"It's me, your dark thoughts."
"The void which visits me every day?"
"The void which visits you every day."

I open the door to nothing and everything at once. It permits itself in my subconscious, grinning a sinister smile, eyes sparkling in feasting from my mind. From the gray mass which molded the pathway to my subconscious, which molded everything thinkable and unthinkable for me.

"May I sit?"
I toil to voice a no, yet my lips crease and swirl until it can express a yes.

The void sits itself on a sacred chair of ethereal sentiments, which I fail to view, as my eyes blindfold itself from such.

The chair douses itself in charcoal, which I fail to view. The grin of the void grows wider, nearly extending to its ear.

"So let's talk."
I forge no reply, as if my ears have been brimming with tinnitus of darkness.
"I know you're hearing," The void speaks again, viewing as I am immobile.

"You know I am here to eat your mind," The void ceases to speak for a moment as I nod my head inadvertently.

"Great!" The void speaks with a grin, "What affliction did you have today?"
"It's all the same," My lips forge the words in staccato, a profound tone out of tune, out of reach.
"Come on, there must be something new," The void conjures a glass of fine brew as it levitates beside it.

“My sister hit me today,” My reflexive lips voice out, lingering at the third word.

“That’s really new,” The void laughs in cacophony, causing the circumference to levitate a bit before it reaches equilibrium.

“Is this the same autistic sister you have?” The void asks before sipping on the brew.
“Yes,” I voice, “She hits mom everyday but,” ceasing it as I swallow, “She hit me today.”
“Is this what I see on your right hand?” The void gestures at the right hand, “Three gashes?”

My hand upheaves itself, as if it can be viewed through my blanketed eyes, the crimson cascading not too many long ago.

My eyes enclose before opening them to jet black.
“I see,” The void voices, eyes enlarging, “Did you relish it?”
My throat is tense, “N-no.”

“If you relished it, I may not have come to you, would I?” The cacophonous laugh resounds in the air again.

I fail to answer verbally.

“At times, silence is consent,” The void grins as it sips on the rest of the brew, before conjuring it to itself. Nothing.

“But in this case, you’re agreeing with me,” The void voices as my lips are ajar before they close, failing to voice. A single profundity of my vocals fails to emanate from my insides.

The airway perceives to be tightened as I toil to breathe, laborious in and out whilst the void stands itself from the chair, the rouge cushion and headrest hashed and tattered, the ivory hue of the wood now ebony, several poison ivies manifesting itself around it.

The cacophonous laugh of the void grows in magnitude as the tinnitus brims in my ears, the poison ivies gliding itself around my bodice, my feet, my tresses as I perceive a forceful pull on my crown, nearly pulling my visuals from myself.

The void glides near me, the grin exhibiting itself amidst the laughs, as its hand glides across the apple of my left cheek, viewing into my panic-stricken eyes with his glistening own.

“Tonight, I shall feast upon the darkness inside your mind! Again!” As its hand grasps the poison ivy on my crown, molding itself into it, the green turning jet black. The void molds itself as the poison ivy with whichever left as the rest forges a cosmic hole in my head, as crimson drips on the ground with no solid.

The cacophonous laugh along the crimson emulsifies into one, and a deathly scream escapes from my mind, as I am engulfed by the heartless.

The Horrors of Failure and the need to ~~Escape~~ Embrace it

Nazifa Tabassum
Student
Department of Economics

No matter where your residence was/is in this globe, if you have had any resemblance of a normal childhood, there is a high possibility that you have been asked “What do you want to be when you grow up?”. So, as you walk down the oh-so ancient ruins of the life you have lived until now, you might cringe visibly at the profound answers you might have given, which range from being a superhero to being a doctor (as your parents have taught you to say).

Regardless of what you and I used to say in front of a pressuring adult, we as human beings are inherently drawn to things that have a lasting impression on us. And as we grow up, and slowly but surely require making many life choices, we end up forming ambitions towards what impacted us the most, which is often in the form of the exploits of a practitioner in a certain field. In many ways, our dreams and ambitions are formed from the basis of perfection.

We humans, the only creatures able to dream, need to pave our own paths towards it. At first, we are eager to pursue our ambitions, and we work hard, push ourselves for it, until we eventually learn as we reach the limits of our abilities, that we may not ever be able to hold a candle to whom we admired. After that, sooner or later we give up.

Some of us move on with our lives, and some of us agonize over our own failures and over the talent and success of others, also known as the “Salieri syndrome”. The concept stems from people’s beliefs of the feud between the Italian composer, Antonio Salieri with Amadeus Mozart, who is well known around the world for his genius musical compositions. In the film “Amadeus”, Salieri had a great deal of talent for recognizing great music, but his composing fell short in front of Mozart. Thus, the film portrayed Salieri’s jealousy leads to his attempts to sabotage Mozart, in the guise of a friend. But even after devoting most of his life to production, Salieri could not achieve the one thing he wished for most, and remained mostly unknown, while Mozart shone.

Although most of us do not take up actions this extreme, we can emphasize with Salieri, because of our struggles with our dreams, even the great Mozart. Some of us get to live their dreams and manage to balance them out with their lives, some keep on pursuing even when they realize it is a path of

destruction, and the majority of us in this world get lost in the uncertainty of future and among our loved ones. Antonio Salieri lives within every one of us who dream.

Therefore, the next time you see someone asking, “What do you want to be when you grow up?” remember to also add “What do you want to be after you give up?” so that they are not afraid of failing as we used to be. For how wonderful it is to fail at something, because we get to try again, and because we get to give up when needed. Because it does not define the purpose of life. Because the purpose of life is to simply live and nothing more, nothing less.

The Lake by the Campus

Nashita Shahid
Student
Department of Environmental Science

Horror stories lay the foundation of my personality. From reading stories about Bhrammodoitto and Shakchunni, watching Aahat on Sony Tv, and listening to Bhoot FM, I tasted it all. My love for creepy chronicles runs deeper than this. How? So many stories represented in so many ways, I know it all, yet I want to know more. So much so that I keep bothering my batchmates to share their scariest stories, after all, I'm not afraid of not being able to sleep at night!

"Hey?" I turn to the girl sitting next to me, "If you aren't busy, can I ask you to tell me your scariest encounter?"

"My scariest encounter? I don't have any," she looks at me. Her ghostly, half-lidded eyes seem to stare right into my soul! "But, if you want, I can tell you the story of the girl who died in our university's lake."

"The university's lake?" I look out the window next to me. The serene view of the calm lake makes it hard to believe it caused someone's death. "How did it happen?"

"It's still unknown. Some say it was suicide, some say it was an accident, that she came too close to the edge of the lake, slipped, and fell."

"Did no one rescue her?" I gap at her, finding it hard to digest the information.

"It happened during early dusk, most students went home and the ones on campus, were either studying in the library or playing football at the field. No one knew someone had fallen into the lake until her dead body was found floating near the bridge."

"It sounds more like a suicide than an accident."
"What makes you say that?"
"I don't know. I just have this feeling..."

It was a lovely afternoon. The setting sun painted the sky with a peachy pink hue, the scattered white clouds looked like fairy dust sprinkled on a vibrant painting. The cool breeze rose small waves on

the cyan-coloured water of the lake. The setting sun and its rays scattered across the small waves, reflecting a dazzling silver-white frame on the lake water.

A completely different image was plastered onto the screen of her mind. The dark clouds of the incomplete syllabus and the impending rain of the semester final painted a picture of a sad monsoon. Then the thoughts of pending assignments blew over her like an icy wind. So cold that it froze her heart and cracked it into several pieces. Nothing mattered. Except for her broken heart and the sharp pain of the broken pieces piercing her lungs.

A shrill voice rang from behind her, chanting, "It's all your fault! It's all YOUR FAULT! IT'S ALL YOUR FAULT!" Her heart jumped to her throat and she looked around. There was no one. Just the soft sound of summer wind and muffled cheers coming from the field not far away from the lake. It was in her head. It was her consciousness. She had all the time, all the opportunity in this universe to avoid where she was standing then. She had chosen to turn a blind eye to it.

Back to the present time, I watch the girl sitting next to me ponder over what I just said. She gives it a good thought. She doesn't understand why I think it was a suicide, not an accident.

"Why would anyone intentionally take their lives?"

I simply shrug. I don't know the answer to her question.

"Who are you talking to?" One of my batchmates approaches the girl sitting next to me. My desk neighbor looks at me. The new fellow follows her line of sight. He doesn't look at me, but at the desk I'm sitting in. It's as if he can see through me!

"Have you not been sleeping enough lately?" The boy asks, turning back to face her.

She scratches her head at his words, now looking through me like he did a minute ago.

"Hey," I call her. She doesn't respond. Why is she pretending like I don't exist?! It hurts. It feels so suffocating. Just the way it felt when I sank deeper and deeper into the cyan-coloured water of the lake.

Debauched with Dewy Rain

Nujhat Aslam
Student
Department of English

Debauched with dewy rain,
I embraced the asphalt pavement.
My back against the half-moist air,
Kept the road company.

I counted the drops as they fell..
One by one, yet many
Drenched my soul with cold caress-
Stirring my precipitated gloom.

Half dazed I stayed drowned,
On my existence they trickled down,
One by one they whispered-
A song with a serene tune.

Though that hardly numbed me,
I inhaled the chronic pain..
Hanging from the thread called life,
Swallowed my helpless self…

I floated above and felt
The throbbing thirsty hearts
crying for a rain…

So I came down as pleasure to a lonely heart
A fantasy to a waiting lover
A drop of life to a withered rose
A hope of dream to a street child
A plot to a poet's mind
A melody to a singer's song
A drop of rain to a fountain where once I was born.

Yearning for Turn

Nishat Anjum Risa
Student
Department of English

It was my turn to live the life
It was my turn to shake the shackles,
It was my turn to pack the passion
It was my turn to leave for love,
It was my turn to see the soul
It was my turn to grasp the glimpse,
It was my turn to tame the time.

It was my turn but instead I sobbed,
It was my turn but instead I stopped;
You ask me why?
Because that, that only turn has been turned into tomb,
Turning my soul into ashes!

The Symphony of Success

Mohammad Fahim Faysal
Student
Department of English

In the vast tapestry of life, you'll find your quest,
A journey of challenges, put to the test.
Through trials and storms, you must persevere,
With strength in your heart, dispel every fear.

Embrace the unknown, for it holds the key,
To unlock the dreams that yearn to be free.
Beyond the horizon, success awaits,
Where courage and passion shall open the gates.

When failure looms, do not be dismayed,
For lessons are learned in the plans that sway.
Rise from the ashes, like a phoenix's flight,
With resilience burning, shining so bright.
Believe in yourself, the power is within,
A champion's spirit, let it begin.
Unveil your potential, a hidden gold mine,
A kaleidoscope of talents that shine.

In moments of doubt, seek the light above,
For the universe conspires in the name of love.
The stars align for those who pursue,
A destiny crafted, bespoke and true.

Nurture your dreams with sweat and toil,
For success comes to those who tirelessly coil.
Each step you take, inch by inch, stride by stride,
Takes you closer to the summit's pride.

Celebrate the journey, not just the goal,
The path you've trodden, your heart and soul.
With gratitude in abundance, let it grow,
In the tapestry of life, love will bestow.

Success is not measured by wealth alone,
But in the legacy, you etch on the stone.
Inspire others with kindness and grace,
A life well-lived, they'll surely embrace.

So, dare to dream, for the dreamers prevail,
Through winds of adversity, they set sail.
In this symphony of life, let your soul play,
And success will guide you each step of the way.

Ode to a Happy Child

Nahreen Saleha Shahadat
Student
Department of English

Painting: Knut Ekwall's "The Shoemaker with his Child"

How nice she must feel
To be in the arms, in the presence, in the flesh with her guardian.
Or maybe she is oblivious
To that sensation of comfort, ease and safety.
For I too had once been oblivious.
That was before I woke up to panic, screams and emptiness;
Before all of a sudden, our house was struck by lightning on a clear day.

How nice she must feel to be oblivious then.
To take for granted the presence of a wonderful man.
Ignorance must truly be bliss,
For I am no longer privileged to be ignorant, nor to be blissful;
Ignorance has been dethroned by memories and strangling flashbacks
That haunts the nights.
No longer privileged to be in the bliss of being loved, held, adored, and cherished
In a manner that is now lost within the infinite celestial cosmos.

How nice she must feel to be in his space and be read to.
To hear a deep melodious and rhythmic voice

Produce words soothingly and calmingly;
A voice that has never yelled or condescended her.
For I too would hear such a voice.
But now it only echoes through my dreams, only sometimes.
Maybe it's the pity of God who listens to me desperately pray to hear those notes,
Or maybe it's a figment of my desperate mind;
Or better yet maybe it's him
Being drawn, through the realms, to the cries of his most precious being.

How nice it must be to see his serious yet calm look.
A disposition that is ensuring and calm.
To see the subtle wrinkles on his forehead;
The lines that are gifts to perfectionists and meticulous men.
For I can no longer trace such lines with my fingers.
As the days when he would often lay his heavy head on my lap,
After tiring days of fighting against injustice, are now gone.

How nice it must be for her to see those hands of his;
Hands that have selflessly provided and have nurtured.
For I am jealous, as
I am now deprived and devoid
Of such tenderness.

How nice this shoemaker's child must feel to not have seen death.
To not know such a haunting state of peace, stillness, numbness and coldness.
For I too have once been a stranger to death,
Unaware that he was a robber;
For he robbed us of a thing far greater than money or jewelry.
Oh, I wish he robbed us penniless, but left us complete.

How nice this blonde little girl must feel to be held by nurturing, loving and strong arms;
To be held and to be safe; to feel forever like a precious child;
To have a place of comfort and warmth:
To have a father.

A New Sunrise

Shurovi Akter
Student
Department of Public Administration

In the depths of night, fear held me tight,
A cloak of darkness, concealing the light.
But with the dawn, a chance to break free,
As the new sunrise whispers hope to me.

With timid steps, I faced the unknown,
The warmth of the sun on fears I'd outgrown.
As the colours danced across the sky,
A newfound bravery began to fly.

The old worries that once gripped my soul,
In the morning glow, began to unroll.
Each beam of light, a balm to my heart,
Healing the wounds, a fresh new start.

With the new sunrise, I found my way,
No longer captive to fear's dismay.
The strength within, I now embrace,
As I walk with courage, grace, and grace.

Embracing the day with hope and might,
I'll conquer the darkness, shine so bright.
For with each dawn, fear loses its guise,
And I'll rise and flourish with each new sunrise.

Cunning Maze

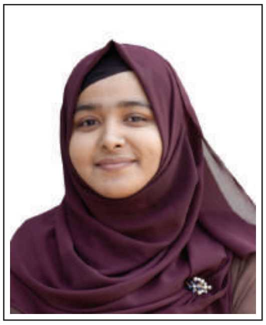

Nuri Shahrin Suba
Student
Department of Public Administration

Waking up she thinks
She needs to live her dream,
Her dreams are stubborn and firm.
That never let her sleep!

In the rainy days
When everyone rests,
She's giving tests,
As her fate keeps playing games.
Patience is the key the world says…..
Every day she comes back
In a dark room with empty hands.

With a mind full of wish
Looking at the mirror she prays,
Hoping for a better day ahead.

Dying to touch laughter
She ends up hugging sorrows,
Seems like being loved is like a golden sparrow!
With a feeling of being lost
Yet she tries to remember
There is something good coming soon.

As someone said,
No-one in the universe gets mistreated.
She also believes that
In a very fine day all the struggles she faced
Will be well paid….
Wearing a fake face, she's living these hard days
To escape the cunning maze.

Power of Knowledge

Tahmina Sultana
Assistant Professor
Department of Business Administration in Management Studies

In the sphere of limitless phenomenon, behold the glowing light,
The lighthouse of illumination, the key that uncovers might.
It's the capacity for knowledge, a treasure to embrace,
A force that shapes the world with its transformative grace.
A force that moulds the earth with its transforming grace.

Through the time's passageways, it has endured the test,
An infinite legacy in humanity's quest.
From ancient documents to the digital domain,
Its charm stays constant to sustain.

It enlightens the meek and strengthens the weak,
The oppressed find solace in the intriguing peak.
In the face of difficulty, it's courage's call,
A sword to conquer obstacles, destroy each wall.

It forges ties between cultures, places, and hearts,
A language of unity that goes beyond all parts,
Its embrace is where empathy grows,
Understanding blossoms, and disagreements are mute.

Therefore, let us crave for knowledge with a sincere heart,
Let curiosity be our guide in whatever we do,
Because of the strength of knowledge, we find our worth,
A treasured present, a legacy for all on Earth.

A Love Song from Nature: Harmony in Bloom

Most. Shanzida Islam Prithibi
Student
Department of Environmental Science

Love finds a home in the gentle hands of nature,
Where flowers of all colours are free to roam.
Each flower is a line in the story of life.
A beautiful and holy melody.
Under the gentle touch of the cerulean sky,
Flowers in the wild move with beauty and grace.
Their sweet-smelling words were like a love letter to the air.
A sign of love that can't be matched.
We take our place in the garden of life.
Bound by the soul of love, in an everlasting hug,
Just as flowers open up in the soft light of dawn,
Love's soft strands make a dream that will last forever.
Like flower petals that turn pink when the sun's warm rays touch them,
We humbly claim love's warmth and kindness.
Even though the seasons change, it stays the same.
From the beginning to the end, a light of hope.
So, let's be brave and true like flowers.
Facing the storms of life with fresh hearts,
In the arms of nature and the soft art of love,
We find comfort that will never leave us.
In this beautiful song about nature, love, and kindness,
A work of art that will last forever,
May these words grow and flourish like flowers in the morning.
A beautiful poem to hold on to and remember.

Negligence

Most. Fatema Tuz Jannat Noor
Student
Department of Mass Communication and Journalism

Every night I gaze at the stars,
I am reminded of your negligence.
They scream on your indifferences
While I only imagine you cupping my face with your cold hands,
making me shiver in eagerness.

Your negligence suffocates my heart,
buries my hopes,
and arouses my restlessness.
Silence has always been a slow poison between us, it fills my soul.

A venom that spreads with each passing second
until I completely lose control.
Scars that never heal.
A sore that bleeds with each inhale,
Even so, you do not feel.

Rising From Ashes

Maliha Ahsan
Student
Department of Business Administration in Management Studies

You held onto me, when I was rising,
You left me as soon as
I started falling.
This is what you come for,
For your instincts it was
I never hoped for
But I, alone am rising from the fall,
As soon as I remembered I could.

Like a phoenix rises from its'
own ashes
I, myself, might rise from my fall.

I was taught to never give up.
You said you were too.
Yet you did give up.
And I was left alone not in Darkness,
only to make myself STRONG.

Don’t be Stressed

Ridwana Islam Ruhama
Student
Department of English

When darkness plunges all around
No light of hope you find
Hold onto thyself a little more
The surrounding shall soon be kind.

When road seems to be endless
Terminal not being in sight
Don’t doubt chasing the dream
Keep wandering day and night.

When everything seemingly goes wrong
Frustration sweeps you away,
Give yourself a pat for coming so long
You can make it again; not going stray.

When your life stuck at a place
Obstacles are mountain high;
Shortly you will find a way
Just give one more try!

Troubles and shackles are just test
To make you the best fit
Take a break when needed,
But don’t just quit.

Believe in Allah’s plan
And give your best;
The last smile will be yours
Don’t be stressed!

Illusory

Azra Mahjabin Nirjhor
Student
Department of English

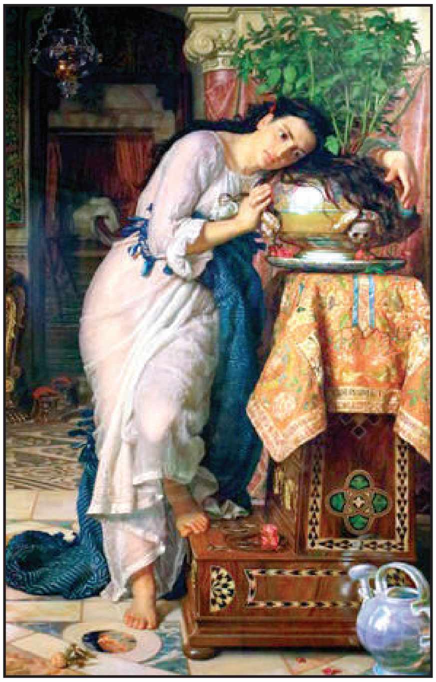

Painting: Isabella and the Pot of Basil by
William Holman Hunt

Like the lover stolen away from Isabella,
Buried beneath the grounds
Found but kept hidden in a vase draped in death
Decorated and stored on a finely embroidered cloth
Like the desires of mine
Is cherished but distant.

Beneath the same roof they sleep
Yet out of each other's reach
I too, share the same bed with my yearnings
With my mind meandering and flowing as smoothly
As her soft black hair.

Isabella keeps the Basil Pot close by
Anticipating a miracle
A prayer that can resurrect her sweetheart
Longing to hear Lorenzo's voice in its enchanting tenor
To keep her thoughts from straying into regions of isolation.

A thirst that cannot be quenched
The agonizing desire to reach a place that doesn't exist
Still the yearning for more keeps growing
Rolling down like tears from Isabella's eyes
From her eyes to her cheeks and finally the ground
But unable to find repose.

The quiet thunder of bereavement
Present but inaccessible
Like looking for a home in a mirage.
My reflection wanders through the starry night
Looking for a sun that can ease the pain
Of having something I don't have.

Sayonara BUP

Shahrukh Khan Akash
Student
Department of Law

Amidst the whispers of memories, I stand
Where I bloomed for years.
Not in tears,
Yet sad
As my journey has come to an end.

In the beauty of the seasons, I found my home,
Four years of honours, a journey of my own,
Since day one the campus has embraced me with open arms,
Now, my Master's year, fading like charms.

A small campus, yet a world in its own sight,
Six seasons painted with colours so bright,
Vibrant festivals that brought us together,
Created memories I will cherish forever.

East and West, two campuses to sit,
Each one a place where memories used to meet,
In the West, we laughed, did dance,
Before the pandemic's unyielding stance.

Oh, the ***Third Place***, where thoughts streams free,
Sharing openly, truly a sanctuary to be,
Embraced in moments of pure joy and tears,
A haven of solace to face our reality and fears.

Monpura, the lake that touched my soul,
Its gentle ripples, made me feel whole,
In the sound, I found my grace,
A place where time seemed too slower than its pace.

Never just the people; it was the land,
The campus, what I truly understand.
Every part, each strand,
A treasure of memories so pure,
Forever in my heart, may it endure.

As I bid farewell, a bittersweet adieu,
I'll carry this place with me, everywhere I go,
For this campus, colourful and grand
Has sculpted me
And with it I will forever stand.

When I was a Child

Asia Begum Shupti
Student
Department of Business Administration in
Accounting & Information Systems

Back in the day, when I was a child.
A heart so wispy, pressure was mild.
Field was green, skies so blue
I danced with joy without any clue.
With guiltless eyes and wholesome dream
Life’s canvas painted without grim.
A carefree soul, free and wild
I try to find that rejoicing child.

Time flies and storms arrived
Life of lies, a soul deprived.
Dreams shattered with tearful eyes
I seek the hope to survive.
Through darkest hours, in scariest night
I shouted loud “Let me fight”.

Though I am lost in life’s trouble
That child in me is still saying “I am capable”.

Death

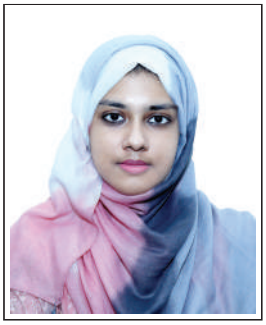

Rubayet Sanzina Ranila
Student
Department of Public Administration

Death is the ultimate truth
From which none can escape
Everyone has to go away one day
Leaving the world far behind

Life once asked death,
“Why does everyone hate you but love me?”
Death said, “Because you’re a beautiful lie,
But I’m the ugliest truth.”

When death is the end for someone,
Who believe they’ll get relief from everything!
So as for someone it is the new beginning
Who believe they’ll have a good life afterwards!

Some die physically
Whereas some die mentally
Some die by their own
But some die for their nation!

Someone dies thousand times before their death,
While someone lives the whole life at that moment!
Don’t die before your death,
Once it’ll come, none can escape.

We want to neither talk nor think about death
As if we are for eternal!
A serial for coming into the world works indeed,
But no serial exists while leaving the place.

পঞ্চাশ বছরের বাংলাদেশ: কী পেলাম, কী পেলাম না

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চেয়ার

১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেছি। বাসা খুঁজতে গিয়ে আবাসন শাখার পরিচালক মিসেস মরিসন-এর মুখোমুখি হলাম। টেলিফোনে বাসা খোঁজা শুরু হলো। বাসা পেলাম। মিসেস মরিসন বলেছিলেন, বাংলাদেশ থেকে আসা এক তরুণ দম্পতির জন্য বাসার প্রয়োজন। ওপ্রান্তে বাসার মালিক বয়স্ক ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেছিলেন,বাংলাদেশ কী? মিসেস মরিসনকে বলতে শিখিয়ে দিলাম, এটা শেখ মুজিবের বাংলাদেশ। ওপ্রান্তের মহিলা তখন বাংলাদেশ চিনলেন, বললেন, মহান নেতার মহান দেশ। ভাবলাম, দেশ অজানা, কিন্তু দেশের জনক জানা। অন্যরকম অনুভূতি সত্ত্বেও সেদিন বুক গর্বে ফুলে উঠেছিল - গর্বিত দেশের আত্মগর্বী নাগরিক। বুঝলাম, বাংলাদেশ নামের মাহাত্ম্য। বাংলাদেশ আমাকে আত্মপরিচয় দিয়েছে, পেয়েছি লাল-সবুজ পতাকা ও সবুজ পাসপোর্ট। বিশ্ব ঢুঁড়ে আমি বলতে পারি, আমি শৃঙ্খলমুক্ত, স্বাধীন, সার্বভৌম। আমার অন্তরে সতত গুঞ্জরণ, বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ।

এখন প্রশ্ন হলো: বাংলাদেশ পেয়ে আমাদের যা করার ছিল, তা কি করতে পেরেছি? ১৯৭২-এর ১২ অক্টোবর, বঙ্গবন্ধু গণপরিষদে বলেছিলেন, স্বাধীনতা মানে দায়িত্বশীলতা। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই, একই কথা বলেছিলেন নন্দিত মার্কিন ইতিহাসবিদ হানাহ আরেন্ডট তার 'ফ্রীডম' প্রবন্ধে, "ফ্রীডম মীন্স রেসপনসিবিলিটি।" বঙ্গবন্ধু কী প্রবন্ধটি পড়েছিলেন? কোনো প্রমাণ নেই। তার বিস্তর পাঠ ছিল; পড়তেও পারেন, না-ও পারেন। তবে স্বীকার্য, দু'জনের চিন্তায় অভিন্নতা ছিল। মহান মানুষেরা এমনই হন। এখন প্রশ্ন: আমাদের দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছি পঞ্চাশ বছরে?

দায়িত্বের পরিসীমা ও প্রকৃতি বুঝতে হলে আগে জানা দরকার, স্বাধীনতার কাছে আমাদের প্রত্যাশা কী ছিল? জানা কথা, ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার আগে মুক্তির কথা বলেছিলেন; মুক্তির কথা একাধিকবার বলা হয়েছিল। বোধগম্য, স্বাধীনতার দূরলক্ষ্য ছিল সার্বিক মুক্তি, যা আমার বিবেচনায় আজও অধরা। মুজিবনগর সরকার ১০ এপ্রিল ১৯৭১, প্রচার করেছিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, তাতে স্বাধীনতার কাছে তিনটি প্রত্যাশা ছিল- সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার, যার কোনো একটিও পঞ্চাশ বছরে অর্জন করতে পেরেছি বলে মনে হয় না। জানি, লক্ষ্য তিনটি কম সময়ে অর্জিত হবার নয়, কিন্তু লক্ষ্যাভিসারীও নই তো আমরা। স্বাধীনতা ঘিরে যে কোনো মানুষের যে স্বপ্ন-নির্মাণ হয়, তা তো কিউবার লড়াকু সৈনিক-কবি হোসে মার্তি বলেছেন,

আমরা মুক্ত, শয়তান হবার জন্য তো নয়
আমরা মুক্ত, মানুষের দুর্ভোগে নির্লিপ্ত থাকার জন্যও নয়
নয় মানুষের শ্রমে নিজের আখের গোছানোর জন্য
নয় চুপচাপ স্থির চোখে তাকিয়ে দাসত্ব দেখার জন্য
আমাদের বলতেই হবে 'না' আবার।

হোসে মার্তি স্বাধীনতা মানে শোষণ-বঞ্চনাহীন এক মানবিক জগতের স্বপ্ন ধারণ করেছিলেন। এমন স্বপ্ন বাংলাদেশ ঘিরে বঙ্গবন্ধুসহ আমাদেরও ছিল। কিন্তু সেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩-এ কবিতা (তার ভাষায় 'গবিতা') লিখে বললেন,

আমার কবিতা নিরবে নিভৃতে কাঁদে
বাংলার ভদ্রলোকেরা চুরি করে
আর মানুষ ঠকায় ফেলে ফাঁদে।
আমি লাল ঘোড়া দৌড়াতে চাই
বুকে পাই ব্যথা
দেশটাকে লুটেপুটে খাওয়ার
জন্য এনেছি কি স্বাধীনতা?

স্বাধীনতা আমাদেরকে স্বপ্নতাড়িত করেছিল, কিন্তু স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় দীর্ণ হতে সময় লাগেনি; বঙ্গবন্ধুর কবিতাই তার প্রমাণ। কিন্তু স্বপ্নের শেষ নেই, স্বপ্ন আজও ধরা আছে, থাকবেও। মানুষ আমৃত্যু স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের ভেতর না বাঁচলে জীবন পানসে হয়ে যায়।

গত অর্ধ্ব শতকে বাংলাদেশ বদলে গেছে। এগিয়েছেও অনেক। পেছনে ফেলেছে ভারত ও পাকিস্তানকে; এবং তা প্রবৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক সূচকে। মাথাপিছু আয়ে আমরা আড়াই হাজার ডলারের ঘরে, যা ভারত-পাকিস্তানের নেই। অ্যালেক্সিস জনসন-এর ভাষায় যে দেশটি তলাবিহীন ঝুড়ি হবার কথা, তার ঝুড়ি তো এখন উপচে পড়ছে। আমরা শিগ্‌গির স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হতে যাচ্ছি। আমাদের অর্জন আমাদের আত্নগর্বী করে। কিন্তু তবুও কোথাও যেন কিছু কিন্তু আছে।

প্রথম কিন্তু মাথাপিছু আয়ের হিসেব। এ যেন এক বিরাট শুভঙ্করের ফাঁক। আমার মধ্যবিত্তের/নিম্নবিত্তের মাথাপিছু আয় কি আড়াই হাজার ডলার? অর্থনীতির এমন পদ্ধতি পুঁজিবাদের তৈরি, যা দিয়ে বিত্তবানকে বোঝা যায়; নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীনকে নয়। দেশে তো নগ্ন পুঁজিবাদ চলমান। বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্র করতে চেয়েছিলেন; করতে দেয়া হলো না, তাকে হত্যা করা হলো, সমাজতন্ত্রকেও। সংবিধানে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সমাজতন্ত্র আছে; কিন্তু তা তো কাজির গরু, খাতায় আছে, গোয়ালে নেই। দ্বিতীয় কিন্তু বৈষম্য; যা ছিল এবং যা বাড়ছে, করোনার ছোবলে বৈষম্য আরও বেড়েছে। সরকার প্রণোদনা দিয়েছে, কিন্তু প্রান্তিক মানুষ কিছুই পায়নি। সরকার এক্ষেত্রে এত উদার যে, প্রণোদনার তালিকায় কওমি মাদ্রাসাও বাদ যায়নি। অথচ জানা আছে কওমী মাদ্রাসা সম্পূর্ণ মুক্তিযুদ্ধবিরোধী। যারা বাংলাদেশে অবিশ্বাসী, তারা প্রণোদনা পায় কী করে? যাহোক, তাজউদ্দীনের বাজেটে দরিদ্র্য কমানোর উদ্যোগ ছিল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বাজেট আমলাতান্ত্রিক আয়-ব্যয়ের হিসাব মাত্র, যাতে দারিদ্র্য কমানোর কোন দিকনির্দেশনা নেই। উপরন্তু, মনে রাখতে হবে তাজউদ্দীন নিজে ছিলেন সমাজতন্ত্রী, এবং অর্থনীতির মেধাবী মানুষ।

তৃতীয় কিন্তুটি দ্বিতীয় কিন্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত। বৈষম্য বজায় রেখে কখনও উন্নয়ন হয় না। উন্নয়ন মানে সমতাভিত্তিক প্রবৃদ্ধি। সুতরাং বাংলাদেশ যা অর্জন করেছে, তা প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন নয়। তবে প্রবৃদ্ধি উন্নয়নের পূর্বশর্ত, যা অর্জনে বাংলাদেশের কৃতিত্ব স্বীকৃত ও নন্দিত। সুতরাং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চালচিত্র সম্পর্কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বয়ানের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করতে হচ্ছে বলে দু:খিত।

যত কিন্তুই থাক, আমাদের অর্থনীতি এগিয়েছে। বিপরীতে কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, রাজনীতি পিছিয়েছে, প্রতিদিনই পিছিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ রাজনীতিহীন দেশ। গণতন্ত্রও প্রশ্নাতীত নয়। গণতন্ত্র চলে দুই চাকার সাইকেলে - তার দুই চাকা সরকার ও বিরোধী দল। বর্তমানে সংসদীয় বিরোধী দল বিরোধী দল হিসেবে বিবেচ্য নয়। অন্যদিকে বিএনপি ও জাতীয় পার্টি বৈধতার প্রেক্ষাপটে প্রশ্নবিদ্ধ; কারণ সেনাছাউনিতে তাদের জন্ম। সেনাছাউনিতে কোনো রাজনৈতিক দলের জন্ম হতে পারে না। সুতরাং রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে এক বৈপরীত্য দৃশ্যমান; যা নিরসন না হলে অদূর ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হুমকির মুখে পড়বে।

বাংলাদেশের বৈষয়িক প্রবৃদ্ধি চোখ ধাঁধানো; কিন্তু বিপরীতে যাদের জন্য এত প্রবৃদ্ধি সেই মানুষ অনুন্নত হয়েছে ক্রমাগতভাবে। সাম্প্রতিক বাংলাদেশ মনুষ্যত্বহীনতার দেশ। অপরাধচিত্র তাই বলে। ইমাম গাজ্জালির বিবেচনায় কোনো দেশের শিক্ষক ও চিকিৎসক অপকর্ম করলে বুঝতে হবে দেশটি রসাতলে গেছে। আমরাও কি রসাতলে যাইনি? রবীন্দ্রনাথ তো অনেকদিন আগে, যখন বাঙালি সাত কোটি ছিল, তখন বিধাতার কাছে অনুযোগ করেছিলেন, "রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করোনি।" আমাদের প্রধান কবি শামসুর রাহমান ২০০৪ এ আক্ষেপ করেছিলেন,

"কে আমাকে বলে দেবে কতদূর গেলে খাঁটি কোনও
মানুষের দেখা পাব? এখন আমার
আশেপাশে খল, ভণ্ড আর ষোলোআনা স্বার্থপর লোক আসা-যাওয়া করে।" (*এ কেমন কালবেলা*)

কবি নির্মলেন্দু গুণ-এর কবিতায় আছে চাঁচাছোলা পঙক্তি,

"মুখের চাইতে মুখোশই এখন
বাঁশের চাইতে কঞ্চির মতো দড়।"
(*সৎশাসকের খোঁজে বাংলাদেশ*)

বঙ্গবন্ধুর "সোনার মানুষ" তো এখন অঙ্গুলিমেয়, সমাজে/রাষ্ট্রে যাদের কোনো ভূমিকা নেই। কাজেই রবীন্দ্রনাথের মতো বিধাতার কাছে আমাদেরও আকুল আবেদন,

পূণ্যে পাপে, দু:খে সুখে, পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।"

গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ থেকে যা পেলাম, তা কম কীসে? যা পেলাম না তার জন্য মন উচাটন থাকবে, থাকবে দুর্মর আকাংক্ষাও; এবং তা তাদের জন্য, যাদের যাপিত জীবন ছিল মুক্তিযুদ্ধলগ্ন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রূপায়নের দলিল ছিল সংবিধান, যা এখন ক্ষত-বিক্ষত; মূল চেতনায় থিতু নেই। এটা মানতেই হবে, বাংলাদেশ এখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। বাংলাদেশের এমন আদর্শিক চ্যূতি, বাস্তববাদী রাজনীতির শাক দিয়ে মাছ ঢাকলেও, তা আসলে বেদনা জাগানিয়া। বেশি কথা না বলে শুধু রাষ্ট্রধর্মের কথা বলি।আমার সীমিত বোধ-বুদ্ধি বলে, রাষ্ট্রধর্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে যায় না। যায় না ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গেও (যা অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে বিদ্যমান)। তেলে-জলে তো মেলে না। রাষ্ট্রধর্ম ইসলামবিরোধী (দ্রষ্টব্য পবিত্র কোরআন ও মদীনার সনদ)। রাষ্ট্রধর্ম বঙ্গবন্ধুবিরোধী (দ্রষ্টব্য ১০ জানুয়ারি ১৯৭২-এর রেসকোর্স ভাষণ)।

তবুও আমার বাংলাদেশ নিয়ে বিশ্বাস হারাতে চাই না। কারণ রবীন্দ্রনাথ আমাকে শিখিয়েছেন, "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।"

রাজা ইডিপাস ও প্রাচুর্য্যের নিরর্থকতা

ড. মোঃ মোহসীন রেজা
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ডিপার্টমেন্ট অব ইংলিশ

মহামারি এই পৃথিবীতে নতুন কিছু নয়। সৃষ্টির শুরু থেকেই প্রায় প্রতিটি শতকেই এই ধরণিতে নেমে আসে এক একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্যান্ডেমিক বা মহামারি। ৫ম খ্রিষ্টপূর্বাব্দে বিখ্যাত গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিসের বহুল পঠিত ও চর্চিত নাটক 'রাজা ইডিপাস'-এ আমরা দেখতে পাই মহামারির করুণ চিত্র এবং প্রাচুর্যময় রাজা ইডিপাস ও তার প্রাচুর্য্যের নিরর্থকতা।

আমরা জানি, যুবরাজ ইডিপাস রাজগৃহে জন্ম নেয়ার পর রাজ জ্যোতিষী যখন এই মর্মে ভবিষ্যৎবাণী দিলেন যে, এই ছেলে তার বাবা-মায়ের জন্য ভয়ংকরতম বিপদ এমনকি মৃত্যু-দূত আকারে আবির্ভূত হতে পারে, তখন তার পিতামাতা সেই নিষ্পাপ একদিনের শিশুটিকে প্রহরীর হাতে তুলে দিয়ে তাকে ধ্বংস করার জন্য নির্দেশ দিলেন। অবোধ শিশুটিকে দেখে বড় মায়া হলো প্রহরীর। সে তাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলো। ফেলে দিয়ে এলো রাজ্যসীমার শেষপ্রান্তে, এক পাহাড়ের কাছে। ভাগ্যের ফেরে পার্শ্ববর্তী থিবস্ রাজ্যের নিঃসন্তান রাজা সে পথ দিয়ে যেতে কুড়িয়ে পেলেন ফুটফুটে শিশুটিকে। নতুনরুপে ভাগ্য আবারো রাজপুত্র বানিয়ে দিলো ইডিপাসকে। ধীরে ধীরে বড় হলেন। তবে থিবস্ এর রাজা তাকে মৃত্যুর আগে জানালেন যে, তাঁর প্রকৃত পিতামাতা অন্য কেউ। যাহোক থিবস্ এর রাজার মৃত্যুর পর ইডিপাস থিবস্ এর রাজা হলেন। বহু রাজ্য জয় করলেন এবং অর্জন করলেন প্রাচুর্য্যের পাহাড়। তাঁর মতো ধনাঢ্য রাজা তৎকালীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রে বিরল ছিলেন। প্রথা অনুযায়ী এক রাজ্য জয়ের পর ইডিপাস বিজিত রাজ্যের এক রানীকে বিয়ে করেন। তার ঘরে আসে ফুটফুটে সন্তান সন্ততি।

এরপর বহুদিন পেরিয়েছে।
ধনাঢ্য রাজা ইডিপাসের থিবস্ রাজ্যে হঠাৎ একদিন মহামারি দেখা দিলো। লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হতে লাগলো। অনেকে পালিয়ে গেল দূরে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। প্রতিকারের জন্য রাজদরবারে প্রতি দিন লক্ষ প্রজার আকুল আবেদন। কিন্তু মানুষের হাতে প্রতিকার কোথায়? সুতরাং ডেলফির মন্দিরে ওরাকলের নির্দেশ বা ঐশী বাণীর জন্য পাঠানো হল তাঁর স্ত্রী রানী জোকাস্টার ভাই অর্থাৎ ইডিপাসের শ্যালক ক্রেয়নকে। ক্রেয়ন খুশির সংবাদ নিয়ে ফিরে এলেন।

বললেন:
ডেলফির মন্দিরে ওরাকল বা ঐশী বাণী নাজিল হয়েছে যে, ইডিপাসের প্রকৃত পিতার হত্যাকারী নাকি এই থিবস্ নগরীতেই লুকিয়ে আছে। আবার সে নাকি ইডিপাসের প্রকৃত মাতাকেও বিয়ে করে বহাল তবিয়তে আছে খুবই শানশওকতের সাথে। তো ঐ ভয়ংকর খুনিকে খুঁজে বের করে হত্যা করলে অথবা নির্বাসিত করলে মহামারির অভিশাপ দূর হবে এবং নগরী আবার সুস্থ ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

একথা শুনে ইডিপাস থ মেরে গেলেন।
রাজা ইডিপাস মরিয়া হয়ে অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন। খুঁজতে লাগলেন তার পিতার খুনী এবং মাতার স্বামীকে। কিন্তু কোথাও কোন খোঁজ মেলেনা ঐ ভয়ংকর খুনির। নিতান্ত নিরুপায় রাজা ইডিপাস অবশেষে গেলেন সেকালের জন্মান্ধ প্রফেট (নবী) টাইরেসিয়াস এর কাছে। ধ্যানমগ্ন হলেন প্রফেট টাইরেসিয়াস। উদঘাটন করলেন এক ভয়ংকর সত্য।

রাজা ইডিপাসকে বললেন-

-মনে পড়ে অনেকদিন আগে কোন এক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে ওরাকল এর মন্দির থেকে ফিরছিলেন একা একা?

-হ্যাঁ মনে আছে।

-এক বৃদ্ধও একা একা গোপনে গিয়েছিলেন ওরাকলের দৈববাণী শুনতে।

-তা আমার জানবার কথা নয়।

-ঠিক তাই, তবে এটাতো নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার যে, ফেরার পথে এক বৃদ্ধের সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছিলো আপনার? রাগের মাথায় তাকে খুন করে ফেলেছিলেন?

ইডিপাস বললেন। হ্যাঁ। মনে আছে।

-সেই বৃদ্ধই আপনার পিতা ছিলেন।

-মানে?

-মানে আপনি নিজেই পিতৃ হন্তারক। অন্যের কাছে মানুষ হওয়ায় আপনি কোনদিনও নিজ পিতাকে দেখেননি। তাই চিনতেও পারেননি। আর ওই বৃদ্ধ ছিলেন এমন এক দেশের রাজা যে দেশ আপনি জয় করেছেন।

-মানে! আর্তনাদ করে উঠলেন ধনাঢ্য রাজা।

প্রফেট (নবী) টাইরেসিয়াস এবারে ফাটালেন তার থেকেও বড় বোমাটি।

বললেন-

-মনে আছে, সেই যে, রাজ্য জয়ে বেরোলেন, আর নতুন রাজ্য জয় করতে করতে একবার এক রাজ্যের বিধবা রাণী জোকাস্টাকে বিয়ে করে আনলেন, তারপর আপনার কত সন্তান সন্ততি হলো?

-হ্যাঁ। কিন্তু সে কথা বলছেন কেন? ইডিপাস বিমুঢ়ের মতো বললেন।

-বিধবা রাণী জোকাস্টাই আপনার প্রকৃত মা। যাকে আপনি ভুল করে বিয়ে করে ফেলেছিলেন। আর তার গর্ভে আপনার যতো সন্তান সন্ততি, সবই আপনার আপন মায়ের পেটের ভাইবোন।

উন্মাদনায় ফেটে পরলেন ধনাঢ্য রাজা ইডিপাস। নিজের অজ্ঞতার দহনে দুঃখে, ক্ষোভে, জীবনকে অসহ্য মনে হলো তাঁর। সকল অর্থ, বৈভব, খ্যাতি ও প্রাচুর্য্য মুহূর্তেই অর্থহীন মনে হলো তাঁর।

সত্য যেদিন উদঘাটিত হয়, সেদিন সকল জ্ঞানীই নিজেকে অন্ধ হিসেবে আবিস্কার করেন। মুর্খ ও অজ্ঞ হিসেবে দেখতে পান, না জানার ক্ষতি কতোটা ভয়াবহ হতে পারে।

প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নিজেই নিজের দু'চোখ খাবলে উপড়ে ফেললেন ইডিপাস।

অতঃপর স্ত্রী তথা প্রকৃতই তার মা জোকাস্টাসহ সকল সন্তান সন্ততিকে একে একে হত্যা করলেন। অন্ধ ইডিপাস চীরতরে রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন নির্বাসনে। আর এভাবেই ভয়ংকর প্লেগের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলো তার রাজ্য। থিবস্ নগরী।

ক'দিন আগের করোনা মহামারীতে আমরা দেখেছি যাঁরা অনেক বিত্ত, বৈভব, অর্থ ও সম্পদের মালিক তাঁদের সমস্ত সঞ্চিত পুঞ্জিভূত সম্পদরাশী এক মুহূর্তেই নিরর্থক হয়ে যেতে পারে, একটা অদৃশ্য জীবাণুর আঘাতে। করোনার ক্রান্তিকালে বেঁচে থাকা কঠিন হলো মানুষের, মৃত্যুই হলো সহজ। আর ভাগ্যের মতোই অদৃশ্য একটা ভাইরাসের আক্রমনে একজন কোটিপতির মৃত্যু কতো সহজেই ইডিপাসের মতো নিরর্থক করে দিচ্ছিল তার সারা জীবনের প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ যক্ষপুরী।

আমাদের শিক্ষার্থীদের বলবো, মনে রেখো সবকিছুরই শেষ গন্তব্য গোরস্থান। কিন্তু কি ট্রাজিক, কোন কিছুই কবরে যায়না। পড়ে থাকে নিরর্থক।

আর আমাদের অর্থ লালসাই এই নিরর্থকতার মূল পুজারী। তাই ছাত্রছাত্রীদের বলবো, এসো সুযোগ পেলেই নিরন্ন, বিপন্ন, দরিদ্র শিক্ষাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াই। কোনদিনও মানবতা ধ্বংস হবেনা যতোক্ষন তার একটিও বন্ধু আছে। যে প্রকৃত বন্ধু খুঁজে পেলো, সে যেন একটি গুপ্তধন পেলো। আর যে বিইউপির একটি শিক্ষার্থীকে পাশে পেলো, সে যেন বিশ্বমানব এর সন্ধান লাভ করলো-এটাই যেন আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি। তাহলেই প্রতিষ্ঠিত হবে এতো আয়োজনের প্রকৃত সার্থকতা। অন্যথায়? প্রাচুর্য্য নিরর্থক, হোক তা জ্ঞানের কিংবা ধনের প্রাচুর্য্য।

তেলিয়াপাড়ার যুদ্ধ

লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান নিয়াজ
টাউন প্ল্যানার
চিফ প্লানিং, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়ার্কস

সূচনা

মুক্তিযুদ্ধের সময় হবিগঞ্জ জেলার তেলিয়াপাড়া অঞ্চলটি তিন নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল। বৃহত্তর সিলেটের সাথে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগের একমাত্র সড়ক ও রেলপথের সংযোগস্থলে তেলিয়াপাড়ার অবস্থান। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন একাধিক ছোট বড় যুদ্ধ এখানে সংগঠিত হয়েছিল।

তেলিয়াপাড়া যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থান

হবিগঞ্জ জেলার সর্বদক্ষিণে অবস্থিত মাধবপুর থানা সিলেটের প্রবেশদ্বার নামে পরিচিত। ভারতীয় সীমান্ত থেকে তেলিয়াপাড়ার অবস্থান ৩ কিলোমিটার উত্তরে এবং মাধবপুর থেকে ৮ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে। তেলিয়াপাড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত চা-বাগান কেন্দ্রিক অঞ্চল ছিল যুদ্ধক্ষেত্র। তেলিয়াপাড়ায় মুক্তিযুদ্ধকালীন মুক্তিবাহিনীর প্রথম সদর দপ্তর স্থাপিত হয়।

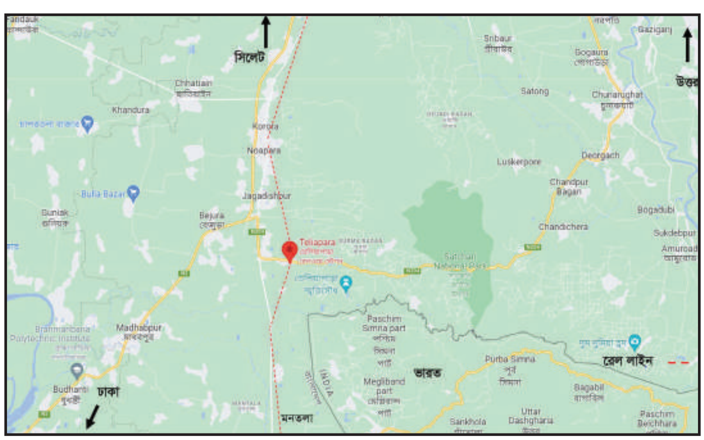

চিত্র ১: মানচিত্রে তেলিয়াপাড়ার অবস্থান

যুদ্ধের পটভূমি

স্বাধীনতা যুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে কুমিল্লা সেনানিবাসে অবস্থিত ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর খালেদ মোশাররফ ভারতের সীমান্তবর্তী তেলিয়াপাড়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত ও শক্তি সঞ্চার করে পরবর্তী সময় পাকিস্তানি বাহিনীকে বিপর্যস্ত করার পরিকল্পনায় ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে ৩০ মার্চ তেলিয়াপাড়া চা-বাগানে আসেন। ৪ এপ্রিল তেলিয়াপাড়া চা-বাগানের ম্যানেজারের বাংলোয় মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারী সিনিয়র সামরিক অফিসার ও কতিপয় সরকারী কর্মকর্তা একত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের

সংগঠিত করার নিমিত্তে এক ঐতিহাসিক সভায় মিলিত হন। সভা কেন্দ্রীয় কমান্ড, মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ, মুক্তিযোদ্ধাদের দায়িত্বপূর্ণ এলাকা বণ্টনসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই মোতাবেক মেজর সফিউল্লাহ সদর দপ্তর স্থাপন করেন তেলিয়াপাড়া চা-বাগানে। ২৮ এপ্রিল পরবর্তী সময়ে ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মূলত তেলিয়াপাড়া ও মনতলা অঞ্চলে অবস্থান গ্রহণ করে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো বলে কুমিল্লা ও সিলেট অঞ্চলে অবস্থিত পাকিস্তানি বাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ, রশদ ও মালামাল সরবরাহের জন্য তেলিয়াপাড়া দখল ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে তেলিয়াপাড়া দখলে রেখে শত্রুদের সার্বিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করাসহ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও সংগঠিত করার জন্য মুক্তিবাহিনীর কাছে তেলিয়াপাড়া গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

চিত্র ২: তেলিয়াপাড়া প্রতিরক্ষায় ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কতিপয় মুক্তিযোদ্ধা
(সূত্রঃ WordPress.com, ২০১২)[১]

যুদ্ধের সংগঠন

ক। মুক্তিবাহিনী: ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যাটালিয়ন সদর তেলিয়াপাড়ায় অবস্থিত ছিল। প্রথম দিকে 'ডি' কোম্পানি থাকলেও পরবর্তী সময় ঐ কোম্পানি মনতলা চলে যায়। তেলিয়াপাড়ার প্রতিরক্ষার জন্য প্রথমে ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূঁইয়া এবং পরবর্তী সময় ক্যাপ্টেন মতিনের নেতৃত্বে একটি ইপিআর কোম্পানি মোতায়েন করা হয়। এর সঙ্গে প্রায় ৭০ জন গণযোদ্ধা অংশগ্রহণ করে (মুক্তিযুদ্ধে সামরিক অভিযান, ২য় খন্ড)[২]।

খ। পাকিস্তানি বাহিনী: পাকিস্তানিদের একটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন ও একটি আর্টিলারি ব্যাটারি এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়া চুনারুঘাট এলাকা থেকেও কিছু সৈন্য এ যুদ্ধে অংশ নেয়।

প্রতিরক্ষা অবস্থান

তেলিয়াপাড়া চা-বাগানে অবস্থিত মেজর সফিউল্লাহর সদর দপ্তরকে কেন্দ্র করে তেলিয়াপাড়া প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে ওঠে। এখানে মুক্তিবাহিনীর প্রথম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। সুরমা চা-বাগানের দক্ষিণ থেকে এ প্রতিরক্ষা লাইন বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্ব-পশ্চিম দিকে বিস্তৃত একটি নালা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বিভক্ত করেছে। নালার উত্তর দিকে ছিল ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদর দপ্তর। মেজর সফিউল্লাহর সদর দপ্তর রক্ষা এবং ঢাকা-সিলেট হাইওয়ে প্রতিরক্ষার জন্য প্রাথমিকভাবে ক্যাপ্টেন ভূঁইয়ার নেতৃত্বে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি একটি ইপিআর কোম্পানি চা-বাগানে প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করে। পরবর্তীতে মাধবপুর থেকে ক্যাপ্টেন মতিনের কোম্পানি এসে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে। আখাউড়া-সিলেট রেল রাস্তা প্রতিরক্ষা লাইনের মধ্য দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। ইটাখোলা-চুনারুঘাট মহাসড়ক হচ্ছে প্রতিরক্ষার উত্তরাংশের শেষ সীমা। প্রতিরক্ষার দায়িত্বপূর্ণ এলাকা ছিল এক বর্গমাইল এলাকাব্যাপী। তেলিয়াপাড়া প্রতিরক্ষা অবস্থানের কিলিং জোন ও পার্শ্ব প্রতিরক্ষা কম ছিল। তেলিয়াপাড়ার ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে মনতলায় ক্যাপ্টেন নাসিম এবং আরও দক্ষিণে হরষপুরে মেজর মঈন তাদের কোম্পানি মোতায়েন করেন। ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান চুনারুঘাটের দক্ষিণ এলাকায় তাঁর কোম্পানি (ইপিআর) নিয়ে অপারেশন পরিচালনা করছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতিয়ার ছিল মূলত কিছু মেশিনগান, সাব-মেশিন কারবাইন এবং থ্রি নট থ্রি

রাইফেল। ২৫ এপ্রিল ১৯৭১ থেকে ২০ মে ১৯৭১ পর্যন্ত এখানে অনেক যুদ্ধ হয়েছিল। প্রশাসনিক সমস্যাগুলোর মধ্যে ছিল খারাপ আবহাওয়া, খাদ্য ঘাটতি এবং যোগাযোগ সরঞ্জামাদির অপ্রতুলতা।

চিত্র ৩: তেলিয়াপাড়ার সীমান্তবর্তী সীমনা এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান
(সূত্রঃ WordPress.com, ২০১২)

যুদ্ধের বিবরণ

পাকসেনারা ২৮ এপ্রিল তেলিয়াপাড়ার দুই মাইল পশ্চিমে জগদীশপুরে তাঁবু ফেলে (তাজুল মোহাম্মদ, সিলেটে গণহত্যা)[৩]। স্থানীয় কতিপয় বালক মুক্তিযোদ্ধাদের বিবিধ তথ্য পাকিস্তানি সেনাদের নিকট পাচারে ভূমিকা রেখেছিল। পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনী প্রাথমিক অবস্থায় গেরিলা কায়দায় বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র অপারেশন করেছিল। ২৯ এপ্রিল ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন মতিন শেরপুর এলাকায় একটি এ্যাম্বুশ স্থাপন করেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আবিষ্কার করেন সেটি ছিল একটি পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। শত্রু ক্যাপ্টেন মতিন এর সেনাদের বিরুদ্ধে গুলি ছাড়াও তিন ইঞ্চি মর্টার থেকে গোলাবর্ষণ করেছিল। ক্যাপ্টেন মতিন তার সেনাদের লালচান্দ চা বাগানে জড়ো করেন। তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে পিছু হটতে বাধ্য হন। ২ মে ১৯৭১ সালে এখান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাপ্টেন মতিন ও ক্যাপ্টেন সুবিদ আলীর নেতৃত্বে শাহজিবাজার পাওয়ার স্টেশনে রেইড করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু তথ্যের ঘাটতির কারণে রেইড প্রচেষ্টা বিফল হয়। ৩ মে শাহজিবাজারের দক্ষিণে নোয়াপাড়া গ্রামের লালচান্দ চা বাগানে মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাপ্টেন মতিন এর নেতৃত্বে শত্রুর উপর এ্যাম্বুশ করে ৩টি ট্রাক ধ্বংশ করতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাপ্টেন মতিনের অধীনে তেলিয়াপাড়া থেকে দূরবর্তী নলুয়া চা বাগানে পাকিস্তানি পেট্রোলের উপর এ্যাম্বুশ করে। তারা শত্রুর ক্ষতি সাধন করে প্রতিরক্ষা অবস্থানে ফেরত আসে। ৬ মে পাকিস্তানিরা দুই কোম্পানি সৈন্য নিয়ে তেলিয়াপাড়া আক্রমণ করে। শত্রু সেনারা ভারতীয় বিএসএফের ছদ্মবেশে আক্রমণ করে। শত্রুর আক্রমণে ক্যাপ্টেন মতিনের মুক্তিযোদ্ধারা প্রথমে কিছুটা অপ্রস্তুত ছিলেন। এ যুদ্ধে ল্যান্স নায়েক আবদুর রহমান তাঁর মেশিনগান নিয়ে অত্যন্ত সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন। যোগাযোগ পরিখাসহ উর্ধ্বস্থিত আচ্ছাদনের কারণে তেলিয়াপাড়ায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল দৃঢ় ও সংহত। শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করে ক্যাপ্টেন মতিন মুক্তিযোদ্ধাদের শত্রুর পিছু ধাওয়া করার নির্দেশ দেন। এ আক্রমণে শত্রুর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের হতাহতের সংখ্যাও কম ছিল না।

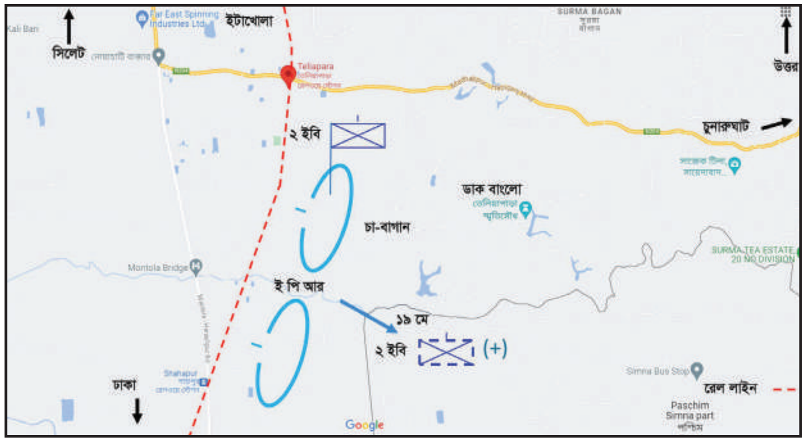

চিত্র ৪: তেলিয়াপাড়ার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান

৮ মে পাকিস্তানিরা জগদীশপুরে ১টি গোলন্দাজ ব্যাটারি নিয়ে আসে। সারাদিন ধরে থেমে থেমে তারা তেলিয়াপাড়া মুক্তিবাহিনীর অবস্থানে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষতিসাধনে ব্যর্থ হয়। ১০ মে শত্রুরা পুনরায় গোলা নিক্ষেপ শুরু করে এবং ১ কোম্পানি সৈন্য নিয়ে তেলিয়াপাড়া আক্রমণ করে (মুক্তিযুদ্ধে সামরিক অভিযান, ২য় খন্ড)[২]। এবারও তারা কোনো উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করতে পারেনি। শত্রুদের চাপ ক্রমশ বেড়ে চলে। ১৬ মে মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাপ্টেন মতিউর এর নেতৃত্বে তেলিয়াপাড়ায় চা-বাগানে সিলেট সড়কে শত্রুর যানবাহনের উপর এ্যাম্বুশ করে। তাঁরা রাতের অন্ধকারে সড়কে ৪টি এন্টি ট্যাঙ্ক মাইন স্থাপন করে। শত্রুকে ধোঁকা দিতে মাইনসমূহের উপর আলকাতরা দিয়ে ঢেকে তার উপর চাকার দাগ বসিয়ে দেয়া হয়। এ এ্যাম্বুশে শত্রুর দুটি গাড়ি ধ্বংস ও দু'টি গাড়ি বিকল হয়। এ পর্যায়ে পাকিস্তানী বাহিনীর সাহায্যার্থে চুনারুঘাট থেকে একদল সৈন্য আসে। এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। ফলে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। এ ভয়াবহ যুদ্ধে ৪০ জন শত্রু সেনা নিহত হয় (মুক্তিযুদ্ধ কোষ, সপ্তম খন্ড)[৪]। তেলিয়াপাড়া সেক্টর হেডকোয়ার্টার দখল করার জন্য পাকিস্তানি সৈন্যরা বহু চেষ্টা করেও সফল হচ্ছিল না। ক্যাপ্টেন মতিনের কোম্পানির মারাত্মক ধরণের ক্ষয়ক্ষতির প্রেক্ষাপটে তাদের বিশ্রামের নির্দেশ দেয়া হয়।

১৯ মে লেফটেন্যান্ট মোরশেদের নেতৃত্বে ২য় ইস্ট বেঙ্গলের এক কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন মতিনের কোম্পানির দায়িত্ব গ্রহণ করে (মুক্তিযুদ্ধ কোষ, সপ্তম খন্ড)[৪]। সেদিনই পাকিস্তানি বাহিনী অপ্রস্তুত তেলিয়াপাড়ার প্রতিরক্ষায় একটি ব্যাটালিয়ন আক্রমণ পরিচালনা করে। আক্রমণের আগে গোলন্দাজ বাহিনী গোলাবর্ষণ করে। লেফটেন্যান্ট মোরশেদের বাহিনী শত্রুদের দুর্বল করার জন্য মর্টার ব্যবহার করে। পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের চাপ বৃদ্ধি পেলে মেজর সফিউল্লাহ তাঁর সদর দপ্তর আন্তর্জাতিক সীমান্তের ওপারে ভারতের ভূখন্ডে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার আগে লেফটেন্যান্ট মোরশেদও তেলিয়াপাড়া ছেড়ে ভারতে গমন করেন। মুক্তিযোদ্ধারা তেলিয়াপাড়া পুনর্দখলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ২০ মে সকালে ক্যাপ্টেন মতিন ও লেফটেন্যান্ট মোরশেদ প্রতি-আক্রমণ শুরু করেন। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ তাঁদের অনুকূলে ছিল না। শত্রুরা মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করে। এর ফলে মুক্তিযোদ্ধারা তেলিয়াপাড়া থেকে পুনরায় ভারতীয় এলাকায় চলে যেতে বাধ্য হয়। জুন মাসেও পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ প্রতিহত করা মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

শত্রু মুক্তি

পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে তেলিয়াপাড়া চা-বাগান থেকে ৩নং সেক্টরের সদর সরিয়ে নেওয়া হয়। মাধবপুর ও চুনারুঘাট এলাকায় ৩নং সেক্টরের অধিনায়ক মেজর কে এম সফিউল্লাহর অধীনে মুক্তিবাহিনীর সাথে পাক হানাদার বাহিনীর অন্তত ২০টি গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ জেলার অসংখ্য নর-নারী হানাদারদের নির্মম নিষ্ঠুরতার শিকারে শহীদ হন। ডিসেম্বরের শুরুতে মুক্তিযোদ্ধারা হবিগঞ্জ জেলা শহরের কাছাকাছি এসে পৌঁছায় এবং শহরে প্রবেশের তিন দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি হানাদারদের আক্রমণ করে। ৫ ডিসেম্বর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা হবিগঞ্জ শহরে প্রবেশ করে এবং ৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে শহরসহ তার আশপাশ ত্যাগ

করতে বাধ্য হয়। ৬ ডিসেম্বর ভোর রাতে পাকিস্তানি সেনাসহ রাজাকাররা আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা হবিগঞ্জ সদর থানা কম্পাউন্ডে বিজয় পতাকা উত্তোলন করে। একই দিন হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট ও নবীগঞ্জ উপজেলাকেও শত্রুমুক্ত করা হয়।

চিত্র ৫: তেলিয়াপাড়ায় মুক্তিযুদ্ধকালীন নিহত কতিপয় সদস্যের স্মরণে লালচান্দ চা বাগানে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ

মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য এখানে নির্মিত হয় একটি বুলেটাকৃতির স্মৃতিসৌধ। বুলেটের নীচের অংশে সোনালী রং এবং মাথায় কার্তুজে লাল রং করা। এটি মুক্তিযোদ্ধাদের 'বুলেট-পণ' সেই শপথ অনুষ্ঠানকেই যেন স্মরণ করিয়ে দেয়। স্মৃতিসৌধটি ২, ৩ এবং ৪নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত। বুলেটটির প্রবেশ মুখের স্তম্ভে কবি শামসুর রহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি খোদাই করা। এর সংলগ্ন একটি স্মৃতি ফলকে মুক্তিযুদ্ধের সেনা প্রধান, সহ সেনা প্রধানসহ আঞ্চলিক অধিনায়কগণের নাম লেখা। বুলেটটির দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বোর্ডে যুদ্ধকালীন তেলিয়াপাড়ায় উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ এবং এরও দক্ষিণে একটি বড় ফলকে মাধবপুর উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামীয় তালিকা খোদাই করা। স্মৃতিসৌধের পাশেই লাল টিনের ছাদসহ ঐতিহাসিক দুই তলা বাংলোটি ইতিহাসের নীরব স্বাক্ষী হিসেবে দণ্ডায়মান। এখানকার ৪ এপ্রিলের সেই ঐতিহাসিক বৈঠকের একটি ভাস্কর্য রয়েছে মেহেরপুরের মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে। সংলগ্ন সীমান্তের অপর পার্শ্বে ভারতীয় বড় শহরটি হল ত্রিপুরা রাজ্যের খোয়াই। সাতছরি সংরক্ষিত বনাঞ্চলটি এ স্থানের পূর্বদিকে অবস্থিত। ঐতিহাসিক বাংলোটি আজও তেলিয়াপাড়া চা-বাগানের ব্যবস্থাপকদের বাংলো হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

উপসংহার

তেলিয়াপাড়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাথমিক পরাজয় ছিল সাময়িক। মুক্তিযোদ্ধারা পুরো ৯ মাস তেলিয়াপাড়া অঞ্চলে রেইড বা এ্যাম্বুশ চালিয়ে পাকিস্তানিদের ব্যস্ত রাখে। এই অভিযানসমূহ আমাদের চূড়ান্ত স্বাধীনতার পথকে প্রশস্ত করে।

তথ্যসুত্র:

[১]WordPress.com, 2012, Retrieved from: https://bornfor71.wordpress.com/2012/05/10/chapter -7-defending-teliapara/

[২]মুক্তিযুদ্ধে সামরিক অভিযান, ২য় খন্ড, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, ২০১৫।

[৩]তাজুল মোহাম্মদ, সিলেটে গণহত্যা, ২০১০।

[৪]মুনতাসীর মামুন, মুক্তিযুদ্ধ কোষ, সপ্তম খন্ড, ২০০৫।

২০ এর একুশ

আসিব হোসেন
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব ইকনোমিক্স

বর্ণ ঘুম থেকে উঠে একই জায়গায় বসে আছে। ছুটির দিনে খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা খুবই বিরক্তিকর। একা একা কী করবে তা ই বুঝতে পারে না সে। অন্যদিন মা ই জাগিয়ে দেয় বর্ণকে। যদিও এতে মায়ের খুব একটা কষ্ট হয় না, এক ডাকেই উঠে পড়ে বর্ণ। সে যাকগে, এখন কী করা যায় ভাবছে বর্ণ। সবার উঠতে এখনো অনেক দেরি। এই সময়টা একটু হেঁটে এলে মন্দ হয় না। কিন্তু হাঁটার জায়গা কোথায়। সেই তো পুরনো রাস্তা, পার্ক। এগুলো যান্ত্রিক লাগে বর্ণের কাছে। তার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে এমন কোথাও চলে যেতে যেখানে এতোসব যান্ত্রিকতা নেই। নির্মল পরিবেশ। এসব ভেবে আর কী হবে। ঝটপট উঠে পড়লো সে। হাত মুখ ধুয়ে এক কাপ চা নিয়ে সোজা চলে গেল বারান্দায়। বাসার এই জায়গাটা তার সবচেয়ে প্রিয়। কয়েকটা গাছ আছে এখানে। মা ই দেখাশোনা করে এগুলোর। মাঝে মাঝে বর্ণ ও যত্ন নেয় অবশ্য। ক্লাস, পড়াশোনার চাপে বেশি সময় দিতে পারে না। চা শেষ করে বই নিয়ে বসলো বর্ণ। গল্পের বই। সময় কাটানোর সবচেয়ে ভালো উপায় এটা। তবে বইটা পড়া আগাচ্ছে না। সমরেশ মজুমদার এর সাতকাহন। মাঝে মাঝে ঈর্ষা হয় বর্ণের। একটা মানুষ কিভাবে পারে এতো সুন্দর করে একটা চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে? বই পড়ার সময় দীপাকে যেন চোখের সামনে দেখতে পায় সে।

১০টা বেজেছে কিছুক্ষণ আগে। মা ছাড়া কেও ওঠেনি এখনো। মায়ের সাথে গল্প করতে ভালোই লাগে বর্ণের। ছুটির দিনে মা একটু দেরি করেই ঘুম থেকে ওঠে। প্রতিদিন কি অমানুষিক পরিশ্রমটাই না করেন এই ভদ্রমহিলা তাদের জন্য। বর্ণ কখনো মুখ ফুটে কিছু বলে না। তবে মাঝে মাঝে কৃতজ্ঞতায় তার চোখ ভরে আসে, সাথে গভীর মমতাও কাজ করে। না বললেও মা যেন তার মনের কথা বুঝতে পারে সবসময়। নাস্তা বানানোর সময় পাশে দাড়িয়ে থাকে বর্ণ।

--চা খাবি?

বর্ণ মুচকি হেসে, “এক কাপ হলে মন্দ হয় না।”

মা চায়ের কাপ বর্ণের হাতে ধরিয়ে চটপট কাজ সারতে থাকে। এমন সময় লিপির ঘর থেকে গানের শব্দ ভেসে আসে। লিপি বর্ণের ছোট বোন। এবার ইন্টারমিডিয়েট দেবে। সে আবার কি যেন বিটিএস ফ্যান। কোরিয়ান ব্যান্ড। সকালে ঘুম থেকে উঠে বিটিএস এর গান না শুনলে নাকি লিপির দিনটাই খারাপ যায়। বাংলা এতো সুন্দর সুন্দর গান থাকতে কেন ভিন্ন ভাষার গান শুনতে হবে তা বর্ণ বুঝতে পারে না। গানের কথাগুলো কি আদৌ লিপি বোঝে?

আচ্ছা বর্ণের কথাই তো বলা হয় নি। বর্ণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকনোমিকসে ২য় বর্ষে পড়ছে। আজকালকার মেয়েদের থেকে একটু আলাদা সে। বই পড়তে ভালোবাসে। চুপচাপ। ভাবুক ধরনের মেয়ে।

চা শেষ করে মা কে জানালো বর্ণ আজ বই মেলায় যাবে বন্ধুদের সাথে। একটু ভয়ে ছিলো সে। মা অকারণে বের হতে দিতে চায় না তাকে। আসলে কিছুটা ভয় পায়। চারিদিকে যেসব খবর পাওয়া যায় তাতে ভয় পাওয়ারই কথা। যাওয়ার কথা শুনে মা

কিছুক্ষণ কাজ বন্ধ করে তাকিয়ে রইলেন বর্ণের দিকে। তারপর কী ভেবে যেন বললেন "আচ্ছা যাও। তবে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।" বর্ণ খুশি মনে আবার বই পড়ায় মন দিলো।

বিকেল সাড়ে ৪টায় বর্ণ গায়ে একটা সুতি শাড়ি জড়িয়ে, আর হালকা সেজে বই মেলার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। আজ বইমেলার পর তারা একটা মিটিং করবে। একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান নিয়ে কিছু পরিকল্পনা দরকার। বইমেলার কাছাকাছি এসেই রিকশা ছেড়ে দিতে হলো বর্ণের। ছুটির দিন বলে আজ এতো ভীড়। রিকশা যাওয়ার জায়গা নেই। বই মেলায় ঢুকে নির্দিষ্ট জায়গায় তাসফি, রায়হান, সূচনা এবং কাইফকে দেখতে পেলো সে। এগিয়ে গেলো সেদিকে। তাসফি ও সূচনা দুজনেই শাড়ি পরে এসেছে। বাকি দুজন পাঞ্জাবি। সবাই মিলে বইমেলা ঘুরতে লাগলো তারা। কয়েকটা বই কিনলো বর্ণ। পদ্মা নদীর মাঝি বইটা কে যেন নিয়ে আর ফেরত দেয় নি। আবার কিনলো বইটা। বইমেলায় এসে বর্ণের একটু মন খারাপই হলো। তথাকথিত ফেসবুক সেলিব্রিটিদের বই বেস্ট সেলার। আর সাধারণ লেখকদের বইয়ের ক্রেতা খুবই কম। কয়েকটা ফেসবুক পোস্ট আর বাংলা ইংরেজির মিশিয়ে জগাখিচুড়ি বানানো কিছু লেখা ছাপিয়ে বই বানিয়ে ফেলা হয়েছে। তা হয়েছে বেস্ট সেলার। কিছুটা হাসিও পেল বর্ণের। আরেকদল মানুষ দেখা গেলো যারা বোধ হয় বইমেলায় এসেছেই সেল্ফি তুলতে।

কিছুক্ষণ ঘুরার পর বর্ণরা টিএসসি চলে গেলো। ওখানেই একুশে নিয়ে আলাপ আলোচনা হবে। যদিও তেমন কিছুই নয়। শুধু প্রোগ্রাম গুলো একটু গুছিয়ে নেওয়া। একটা ফাঁকা জায়গা দেখে ওরা বসে পড়ে। পরিকল্পনার মাঝখানে সূচনা হটাৎ অদ্ভুত একটা কথা বলে ওঠে। একুশে উপলক্ষে গল্পলেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। গল্প জমা দেওয়ার আরো ২ দিন সময় আছে। সূচনা, পূজা আর শামিম গল্প বাছাইয়ের দায়িত্বে ছিলো। তারা খেয়াল করেছে গল্পের কাহিনী ভালো হলেও বেশির ভাগ গল্পই বাংলা ইংরেজি মিশ্রিত। পড়লেই মনে হয় ভাষার কী করুণ অবস্থা! তখনি রায়হান হেসে ফেললো। বলে উঠলো যেখানে বইমেলায় বেস্ট সেলার হয়েছে ফেসবুক সেলিব্রিটিদের বই। ফেসবুক পোস্ট তুলে দিয়ে গোটা একটা বই লিখে বইমেলায় প্রকাশ করা যায় সেখানে এসব তো কিছুই না। কিছুটা চিন্তিত দেখালো বর্ণকে। কাঈফ ব্যাপারটা খেয়াল করে। কোনো সমস্যা নাকি প্রশ্ন করায় বর্ণ জবাব দেয়,
--এটা ঠিক হচ্ছে না। এর শেষটা কোথায়? এরকম চলতে থাকলে এক সময় আমাদের এতো সুন্দর বাংলা ভাষা পুরোপুরি বিকৃত হয়ে যাবে। ফলাফল কী ভয়ংকর হবে ভাবতে পারছিস তোরা?
এতক্ষণে সবার মধ্যে এক ধরনের দুশ্চিন্তা দেখা গেল। 'আসলেই এর শেষটা কোথায়?' তাসফিই প্রথম মুখ খুললো,
--'আমরা সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদের হাতে তো কিছু নেই।'
বর্ণ বললো।

-- সবাই যদি 'আমাদের হাতে কিছু নেই' ভেবে বসে থাকে তাহলে অবস্থা আরো খারাপের দিকেই যাবে। আমরা হয়ত সব পরিবর্তন করতে পারবো না তবে চেষ্টা তো করতেই পারি। এই একুশেতেই আমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে কিছু করতে পারি।
সবাই তার কথায় একমত দেখে বর্ণ কিছুটা আশ্বস্ত হলো। আপাতত এর জন্য তারা ভেবে রাখলো একটা নাটক করা হবে। এই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে, তারপর বর্ণ এ ব্যাপারে কিছু কথা সবার সামনে তুলে ধরবে।
বাকিটুকু পরদিন ক্যাম্পাসে আলোচনা করবে বলে সবাই যার যার বাসায় ফিরলো।

২১ ফেব্রুয়ারি আজ, বর্ণরা খুব দুশ্চিন্তায় আছে। নাটক শেষে বর্ণ কিছু কথা দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছিল। সেখানে তথাকথিত ফেসবুক সেলিব্রিটিদের বই প্রকাশ এবং বেস্ট সেলার হওয়ার ব্যাপারটাও উঠে এসেছিলো। এতে কিছু দর্শক খুব ক্ষ্যাপা। হঠাৎ করেই পরিবেশ অন্যদিকে চলে যায়। প্রথমে হালকা গুঞ্জন থেকে আস্তে আস্তে বিস্ফোরণের মতো কিছু মানুষ বোতল ছুঁড়তে থাকে তাদের দিকে। আবার যারা ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পেরেছে তারা অন্যদেরকে থামানোর চেষ্টা করে ঠিকই। কিন্তু ততক্ষণে জল অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। হঠাৎ কীভাবে যেন ব্যাপারটা হাতাহাতিতে চলে যায়। এরপর খুব অল্প সময়ে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে যায়। বর্ণরা এই ব্যাপারটার জন্য তৈরি ছিলো না একদমই। পুলিশ এসে পরিস্থিতি কিছুটা সামলে নেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবরটা ছড়িয়ে পরে চারিদিকে।

বর্ণ বাসায় ফিরে দেখে মা বাবা চিন্তিত মুখে টিভির দিকে তাকিয়ে আছে। বর্ণদের খবরটাই চলছিলো টিভিতে। বাসায় ঢুকেই বর্ণ বুঝতে পারে মা, বাবা খুবই রেগে আছে তার উপর।

কিন্তু সে কি রাগ করার মতো কিছু করেছে? ভেবে পায় না বর্ণ। তবে কেন আজ সে এতোগুলো বকা শুনলো? বাবা, মা তার জন্য চিন্তিত তাই হয়তো এতোগুলো কথা বলেছেন। কিন্তু সে ভুল তো কিছু করেনি। কাউকে না কাউকে তো এই পদক্ষেপ নিতেই হতো। যদি ১৯৫২ সালে বাবা মায়েরা তাদের সন্তানদের প্রথমেই আটকে দিতেন তাহলে কি আজ এই দিনটা এতোটা গৌরবের হতো। আমরা কি আমাদের মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে পারতাম? সেদিন যদি বাবা মায়েরা সন্তানের মায়া ছেড়ে নিজের দেশ, ভাষার কথা না ভাবতেন তবে কি হতো এতোকিছু? ওই ত্যাগের কাছে তারা কি খুব বেশি কিছু করার চেষ্টা করেছিল? ভালো লাগছে না বর্ণের। কান্না পাচ্ছে তার।

ফোন এর রিংটোন বেজে ওঠে হঠাৎ। তাসফির নাম ভেসে ওঠে স্ক্রিনে। বর্ণদের আজকের নাটক এবং নাটক পরবর্তী ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এ নিয়ে ২ দল তৈরি হয়েছে। একদল বর্ণদের পক্ষে। আরেকদল তথাকথিত ফেসবুক সেলিব্রিটিদের ফ্যান। তারা মনে করে এটা পরিকল্পিতভাবে তাদের অপমান করা।

বর্ণ ফেসবুকে লগইন করে দেখে তার ইনবক্সে মেসেজের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। সবাই একই ভিডিও শেয়ার দিচ্ছে তাকে। তার ফেসবুক পোস্ট কমেন্টে ভরে গেছে। তার মধ্যে একদল খুব কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করছে তাকে। মুহূর্তে তার ফলোয়ার বেড়েছে হাজারখানেক। তাকে নিয়ে ইভেন্ট পেজ খোলা হয়ে গেছে কয়েকটা ফেইক প্রোফাইলও তার নামে দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ নিজে নিজেই লগ আউট হয়ে গেলো সে ফেসবুক থেকে। বুঝতে বাকি রইলো না তার। আইডি হ্যাক হয়েছে তার। সে নিজেই এখন সেলিব্রিটিদের কাছাকাছি চলে গেছে এই ফেসবুকের বদৌলতে। হাসি পাচ্ছে তার। কি চেয়েছিল সে আর কি হলো।

মায়ের ডাকে ফিরে তাকালো বর্ণ। তার আত্মীয়রা ফোন দেওয়া শুরু করেছে। বাবা মা তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে হাঁপিয়ে গেছেন। অপমানিতও হচ্ছেন বার বার।

ভালো কিছু করতে গেলে এসব বাধা আসবেই। এই ভেবে সান্তনা দিলো সে নিজেকে। তবে এবার সে শেষটা দেখতে চায়। ব্যাপারটা যখন এতোদূর এসেছে তাহলে শেষ পর্যন্ত লড়বে সে, ঠিক করে নেয় মনে মনে।

ভাগ্যিস! ১৯৫২ এর মানুষগুলো ২০২০ এর আধুনিক মানুষগুলোর মতো ছিলেন না। এমনটা হলে আজ বাংলা ভাষার অস্তিত্বই থাকতো না বোধহয়, বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন দেশ তো বহু পরের কথা। ৫২ এর একুশে এই দেশের মানুষগুলোই নিজের মাতৃভাষাকে রক্ষা করেছিলেন জীবন দিয়ে, ২০ এর একুশে সেই মাতৃভাষার মর্যাদা বজায় রাখতে এ প্রজন্মকেই এগিয়ে আসতে হবে, বার বার এই একটা কথাই বর্ণের মনে দাগ কেটে যায়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে শিক্ষা এবং গবেষণা

ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক
ডিপার্টমেন্ট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স

আমি যখন কাউকে পরিচয় দেই 'আমি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে জাপানে স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি শেষ করে শিক্ষকতা করছি', অনেকেই ভ্রু কুঁচকে তাকান, কেউ কেউ আর একটু আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করেই ফেলেন 'এটা নিয়েও মানুষ পড়ে!' আমি প্রথম দিকে একটু হয়ত বিরক্ত হতাম, বা এড়িয়ে যেতাম। তবে এখন মিটি মিটি হাসি, আমার হাসি দেখে ওনারা আরও অবাক হন, ভ্রু কুঁচকানো আরও হয়ত বেড়ে যায়। মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করি, কেউ কেউ আগ্রহ নিয়ে শুনেন, কেউ কেউ আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। মনে পড়ে শাহরুখ খানের ঐ যে বিখ্যাত স্বদেশ সিনেমার কথা। নাসা থেকে আসার পর, গ্রামের মানুষ অবাক হয়ে যান, 'ওয়েদার প্রেডিকশন' নিয়েও মানুষ গবেষণা করে, এটাতো গ্রামের সাধারণ মানুষই পারে!

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে শিক্ষা এবং গবেষণা আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে হয়তোবা নতুন। তবে সামাজিক বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান, ভূগোল অথবা ভূতত্ত্ব বিভাগে এই বিষয়ে অনেক আগে থেকেই শেখানো হয়। সারাবিশ্বব্যাপী আমরা যখন বিভিন্ন দুর্যোগ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, এই দুর্যোগ থেকে কিভাবে মানব প্রজাতিকে রক্ষা করা যায় তা নিয়ে সর্বদা চিন্তিত, তখন কেন এই বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা এবং গবেষণা হবে না?

দুর্যোগ আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেই আদিমকাল থেকেই। আমরা হযরত নূহ (আঃ) এর সময়ের ভয়ঙ্কর বন্যার কথা চিন্তা করি। মহান সৃষ্টিকর্তা ওঁনাকে জ্ঞান দিয়েছিলেন ঐ ভয়ঙ্কর বন্যার কবল থেকে রক্ষা পেতে হলে কী করতে হবে। যারা ঐ জ্ঞান মেনে চলেছিল তাঁরা বেঁচে গিয়েছিল। সারা বিশ্বের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়েও যদি বিবেচনা করি, তাহলে দেখতে পাব দুর্যোগ আসার আগে যারা এটা নিয়ে জ্ঞান অর্জন করেছেন তাঁরাই এগিয়ে গেছেন। একটা দুর্যোগ আসার আগে আমাদের কী করতে হবে, দুর্যোগ চলে আসলে কীভাবে নিজেকে এবং পরিবারবর্গকে বাঁচাতে হবে, সম্পদ রক্ষা করা যাবে, দুর্যোগ চলে গেলে কীভাবে স্বাভাবিক জীবনে আবার ফিরে যাওয়া যায়, এই সব কিছু নিয়েই দরকার ব্যাপক শিক্ষা এবং গবেষণা। মানুষকে সব সময়ই দুর্যোগের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে হয়েছে। কিন্তু এই মোকাবিলাটা সঠিকভাবে কী আঙ্গিকে করা উচিত তাই আমরা শিখি এবং প্রয়োগ করি। এই যেমন, কিছুদিন আগেই মহামারী করোনা থেকে কীভাবে আমরা টিকে থাকব এটা নিয়ে সবাই আমরা ব্যস্ত ছিলাম। আমরা যদি করোনার প্রথম দিককার কথা চিন্তা করি, তাহলে দেখব আমরা কিছুই আসলে জানতাম না কী করা উচিত। করোনা থেকে রক্ষা পেতে হলে, কীভাবে এই প্রাণঘাতী ভাইরাসকে ঠেকানো যায় ছড়িয়ে যাওয়া থেকে, ইত্যাদি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিভিন্ন নির্দেশনা আমাদের দিয়ে গেছে। এইসব নির্দেশনা কীভাবে আসছে? ঐ যে এটা নিয়ে জ্ঞানচর্চা এবং ব্যাপক গবেষণা থেকে। করোনা নিয়ে এখনও অনেক অনেক গবেষণা চলছে, চলবে। আমি যখন জাপানে উচ্চ ডিগ্রী নিতে যাই, তখন জাপানজুড়ে সুনামি নিয়ে রীতিমত হইচই ২০১১ সালের সুনামির বিধ্বংসী আচরণ জাপানকে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। জাপানজুড়ে সুনামি নিয়ে ব্যাপক জ্ঞানার্জন এবং গবেষণা চলছে, কীভাবে সুনামি থেকে নিজেদের রক্ষা করা যায়, কীভাবে সুনামি আসার আগেই জানা যায়, কীভাবে প্রস্তুতি নেয়া যায়, ইত্যাদি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে শিক্ষা এবং গবেষণার ব্যাপ্তি ব্যাপক। দুর্যোগকে কীভাবে ঠেকানো যায়, কীভাবে এর ফলে ক্ষতি কমানো যায়, এইসব নিয়ে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন গবেষণা চলছে। কেউ কেউ দুর্যোগের কারণ নিয়ে গবেষণা করছেন, কেউ কেউ মানুষের দুর্যোগ নিয়ে প্রস্তুতি এবং আচরণ নিয়ে গবেষণা করছেন, কেউ কেউ একটা দুর্যোগের অবস্থা নিয়ে গবেষণা করছেন। গবেষণা থেকে বেরিয়ে আসে কোন ধরনের মানুষ সবথেকে ক্ষতিগ্রস্থ, কেন ক্ষতিগ্রস্থ, কীভাবে তাঁদের ক্ষতি কমানো যায়, কেন কিছু দুর্যোগ কিছু জায়গায় বারবার হয়, কেন নতুন নতুন দুর্যোগ আসে, ইত্যাদি। যেমন, করোনার সময় আমরা দেখতে পেয়েছি অনেক মানুষই যা যা করতে বলা হয়েছে তা তাঁরা জানা সত্ত্বেও মানছেন না। অনেক রকমের ভুল তথ্য তাঁদের বিভ্রান্ত করেছে, তাঁরা বিশ্বাসযোগ্য তথ্য এবং মাধ্যম কোনটা তাই বুঝতে পারছেন না। এই ধরনের মানুষদের অন্যান্য ব্যাপার, যেমন তাঁদের জীবন ব্যবস্থা, তাঁরা সাধারণত কোন মাধ্যম ব্যবহার করেন তথ্যের জন্য, তাঁদের অবিশ্বাসের কারণ ইত্যাদি গবেষণা করে জানা যায়। আর এই গবেষণার তথ্য উপাত্ত থেকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবর্গ ব্যবস্থা নিতে পারেন। বাংলাদেশে বজ্রপাতকে দুর্যোগ হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এখন এই বজ্রপাত এর ফলে কোথায় সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ, কোন ধরনের মানুষ সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ, কেন ক্ষতিগ্রস্থ এবং কী করা যেতে পারে বজ্রপাতের ফলে ক্ষতির পরিমাণ কমাতে ইত্যাদির জন্য দরকার গবেষণা এবং এর থেকে অর্জিত জ্ঞান নিয়ে চর্চা। আর এই জ্ঞানচর্চার ফলে বের হয়ে আসবে নতুন জ্ঞান, যেই জ্ঞান হয়ত একসময় বজ্রপাতকে না আটকাতে পারলেও, এর ফলে ক্ষতির পরিমাণ কমাতে পারবে।

জ্ঞানচর্চা ছাড়া যে কোন সমস্যা, তা হোক করোনা অথবা বজ্রপাত, অথবা অন্য যে কোনো ধরনের দুর্যোগ, দূর করা দুরূহ। নতুন নতুন সমাধান আসতে পারে জ্ঞানচর্চার মাধ্যমেই। আমি যখন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করি, নতুন নতুন জ্ঞান বেরিয়ে আসে, গবেষণা করার উপায় খুঁজে পাই। তবে এই শিক্ষা এবং গবেষণার প্রয়োগ জরুরি। ভালো ডাক্তার (Good Doctor) নামে নেটফ্লিক্সে খুবই বিখ্যাত সিরিয়াল আছে। কিছু নিবেদিত ডাক্তার নিয়ে সিরিয়াল, যারা তাঁদের রোগী নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। জটিল জটিল অস্ত্রোপচার করে ফেলেন। যেগুলো খুবই জটিল, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁদের আলাদা একটা আলোচনার রুম আছে যেখানে তাঁরা প্রকাশিত গবেষণা নিয়ে আলোচনা করেন; কীভাবে ঐ গবেষণার ফলটা তাঁরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। ঠিক এমনিভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে যারা নীতি নির্ধারণ করেন, দুর্যোগের সময় মানুষের পাশে থেকে মাঠ পর্যায়ে কাজ করেন, সবার জন্য নতুন নতুন গবেষণা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। তাহলে আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আরও যুগোপযোগী হবে, আমরা আরও ক্ষতি কমাতে পারব। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তিন ধাপে কাজ করা যেতে পারে, অথবা করা উচিত। কেউ কেউ গবেষণা করবে, কেউ কেউ সেই গবেষণার ফল থেকে নীতি নির্ধারণ করবে এবং সব শেষে কেউ কেউ ঐ নীতি প্রয়োগ করবে মাঠ পর্যায়ে। উন্নত দেশগুলোতে এমনটাই হয়।

আরেকটি জরুরি বিষয় হচ্ছে, আমরা যে কোনো কিছু নিয়ে অধৈর্য্য হয়ে পড়ি। কেউ হয়ত একটা গবেষণা করছেন, ভাল ফলের জন্য সময় লাগবে, আমরা অস্থির হয়ে পড়ি! আবার কেউ কেউ হয়ত একটা গবেষণা করে ফেলেছেন, আমার তৎক্ষণাৎ এর ফল আশা করি। একটা গবেষণা করতে অনেক অনেক সময়ের দরকার হয়, একজন গবেষককে (তা হোক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অথবা অন্য যে কোন বিষয়ের) পর্যাপ্ত সময়ের সাথে সাথে অন্যান্য কাজ থেকে অবকাশ এরও প্রয়োজন পড়ে, যা আমরা দিতে চাই না। আমরা একজন গবেষককে এবং তাঁর গবেষণাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পিছপা হই না। যিনি গবেষণা করেন, তিনিই জানেন কী পরিমাণ কায়িক এবং মানসিক পরিশ্রম করতে হয়! কী পরিমাণ জ্ঞান স্পৃহা তাঁকে তাড়িয়ে বেড়ায়, নতুন নতুন গবেষণা করার জন্য! আর এর জন্য কী পরিমাণ ত্যাগ তাঁকে স্বীকার করতে হয়! আর শিক্ষা এবং গবেষণা ছাড়া একটা জাতি কখনই দাঁড়াতে পারবে না, তা আমরা যত আঙ্গিকেই ব্যাখ্যা করতে চাই না কেন। আর উন্নত শিক্ষা এবং গবেষণার জন্য দরকার সবার সম্যক আকাঙ্ক্ষা, সাহস, সহমর্মিতা, সহযোগিতা এবং সর্বোপরি ভালবাসা। ভালবাসা জ্ঞানচর্চার প্রতি, যিনি জ্ঞানচর্চা করেন তাঁর প্রতি।

কর্মজীবী মা ও বন্ধুরা

তাহেরা দিল আফরোজ
সহকারী পরিচালক
শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র

বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে একসাথে প্রায় ছয়টি বছর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-উচ্ছ্বাস-আবেগ কিংবা অভিমান ভাগাভাগি করে পার করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই কখন যে আরেকটা পরিবার তৈরি হয়ে গেছে বুঝতেই পারেননি মিতি, আদ্রিতা, প্রমি ও মিমরা। পরিবার বলাটা ভুল হবে, এটা ওদের পরিবারের থেকেও অনেক বেশি। এখানেই ওরা নিজেদের প্রকাশ করে নিজেকে উজাড় করে। নয়টি বিভাগের এগারজন মিলে ওরা আগলে রাখে নিজেরা নিজেদের। প্রায় এক যুগ পর এগারো জন আবারও এক হয়েছে প্রাণ খুলে নিজেদের উজাড় করে দিতে। বসেছে প্রিয় ক্যাম্পাসের লাল ইটের কার্জন হলের মাঠে থেকে সেই নাগলিঙ্গম গাছের তলাতে। কৈশোর থেকে সদ্য যৌবনে পা রাখা ওরা যেখানে বসে কার্ড খেলতো বা গল্পে-হাসি-ঠাট্টায় ঢলে পড়তো একে অপরের গায়ে। আজ আর ব্যাগে কার্ড নেই, আছে অনেক স্মৃতি আর ফিডার-ডায়াপার, বেবি ফুড-পানি। জীবনে অনেকটা পরিবর্তন, প্রতিষ্ঠা, সাফল্য তার নতুনত্বের স্বাদ এসেছে। হলের ছাদে বসে একসাথে এফএম রেডিও শোনা সখিরা আজ সবাই কর্মজীবী, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা। সকলেই এখন সংসারে পুরোপুরি মনোযোগী, এক বা দুই সন্তানের জননী। কারো কারো সন্তান আবার স্কুলের দুই তিন ক্লাশ পারও করে ফেলেছে। সবাই উচ্ছ্বাসিত হয়ে গল্পে মেতে উঠে নিজ নিজ সন্তানদের দুষ্টু-মিষ্টি গোছালো কিংবা এলোমেলো কার্যকলাপে। অনেক ভিন্নতা সত্ত্বেও ওরা এগারো জন একটা জায়গায় সম্পূর্ণ এক এবং অভিন্ন। ওরা সবাই কর্মজীবী মা। প্রতিদিনের যুদ্ধটা যেন সকলেরই এক রকম। আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখার মতো এক-অপরকে দেখতে পায় যেন সবাই।

কাকডাকা ভোরে ঘুম থেকে উঠেই দিনের ব্যস্ততা শুরু হয়। ঘড়ির কাটার সাথে পাল্লা দিয়ে একটু একটু করে ভরে উঠতে থাকে ব্যাগ। নিজের প্রস্তুতির সাথে রেললাইনের মতো করে চলে সন্তানের প্রস্তুতি; তারও তাড়া অনেক অফিস যাবার। সেও তো মায়ের সাথে যাবে তার রুটিন মতো, যতক্ষণ মা তার কর্মক্ষেত্রে কাজ করবে ততক্ষণ সেও থাকবে অফিসের শিশু দিবা যত্নকেন্দ্র তথা ডে-কেয়ার সেন্টারে। সমগ্র দিনের খাবার, কাপড়, সাবান-শ্যাম্পু, লোশন-পাউডার কিংবা তার প্রিয় খেলনাটি সবই গুছিয়ে নিতে হয় নিজের প্রস্তুতির সাথে। একজন কর্মজীবী মা জানে সন্তানকে বড় করতে কতটা যুদ্ধ করতে হয় তাকে। প্রতিদিন নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ, আর প্রতিকূলতার সম্মুখীণ হতে হয়, নিজেকে নিজেরই সান্ত্বনা দিতে হয় সকল প্রতিকূলতাকে জয় করে এগিয়ে যাবার। বন্ধুরা মিলে গল্প করে, এগিয়ে নিয়ে যায় তাদের প্রতিদিনের যুদ্ধকে জয় করার অভিজ্ঞতাগুলোকে।

যুদ্ধের অন্যরূপ বেরিয়ে আসে তাদের আড্ডায়, আর তা হলো অনেকের অফিসে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র নেই। বাবা-মা দু'জনই কর্মজীবী হওয়ায় বাসায়ও সন্তানকে দেখভাল করার কেউ নেই। এক্ষেত্রে ভরসা বাসার সহায়তাকারী কিংবা প্রাইভেট ডে-কেয়ার সেন্টারগুলো। বাড়তি সুবিধা ভোগ করতে পারে একান্নবর্তী পরিবারে যদি কারো মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ি কিংবা পরিবারের কোনো আত্মীয় সন্তান পালনে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। একজনতো চাকুরি ছেড়ে দেওয়ারও মনঃস্থির করেছে সন্তানের ভালোর কথা চিন্তা করে। চাপা কষ্ট পাথর চাপা দিয়ে নিজেকে তিল তিল করে গড়ে তোলে স্বপ্নের চাকুরি ছেড়ে দিতে হচ্ছে আরেক স্বপ্নকে প্রতিষ্ঠিত করতে। সংসারের সমস্ত কাজে সন্তানের সকল দায়িত্ব, পড়ালেখা, সামাজিকতা রক্ষা করা, আত্মীয়-পরিজন সবকিছুতেই

নারীকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয় চেতন কিংবা অবচেতন মনে। নারীরা সব করে খুশি মনে কিন্তু পরিবারের বোঝাপড়ার ব্যাপারগুলো অনেক ক্ষেত্রেই যেন এখনো সেকেলেই রয়ে গেছে।

বন্ধুরা কথা বলে, নিজেদের নিয়ে পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থা নিয়ে প্রথম শ্রেণির সরকারি-বেসরকারি কর্মচারী কিংবা ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী সকল কর্মজীবী মায়েদের গল্পই যেন এক ও অভিন্ন। সংসারে মায়ের ছুটি নেই কখনোই; বিশ্রাম যেন বিলাসিতার অন্য নাম। সম্পর্কের টানেই মা তার স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা এবং দায়িত্ববোধ থেকেই সন্তানকে রেখে পিছপা হতে পারে না। চালিয়ে যায় অবিরাম লড়াই। শহর কিংবা গ্রাম সব জায়গাতেই কর্মজীবী মায়েদের চিত্রগুলো প্রায় একই রকম।

এবার আসি তথ্যচিত্রে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় ব্র্যাক রংপুরের রৌমারিতে ত্রাণ সহায়তা কর্মসূচি চালু করে। সে সময়ের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে স্যার ফজলে হাসান আবেদ বলেন, "আমি রংপুরে গিয়েছি। তখন দুর্ভিক্ষ চলছে। রংপুরে অনেক শিশুকে আমি দেখেছি যাদের বাবা দায়-দায়িত্ব ফেলে পালিয়েছেন। কেউ কেউ হয়তো বৌ-বাচ্চার খাবার জোগাড় করতে পারেননি বলে অন্যত্র কাজের সন্ধানে গেছেন। কাজ পাননি বলে তিনি আর ফিরে আসেননি। যে কারণেই হোক তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন। কিন্তু মা তার সন্তানকে ফেলে চলে যাননি। তার নিজের পেটেও খাবার নেই। বাচ্চাও খেতে না পেয়ে চোখের সামনে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। কিন্তু সন্তানকে ফেলে তিনি পালাতে পারছেন না। আমার স্থির বিশ্বাস; বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারেন এই মহিলারাই। বাচ্চার পেটে যদি খাবার না থাকে, তাহলে কার কাছে এসে কান্নাকাটি করবে? মায়ের কাছে। ঘরে যদি খাবার না থাকে মা তখন পাশের বাড়ি বা অন্য কোথাও থেকে খাবার এনে বাচ্চাদের খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। একজন আত্মীয় যখন বাড়িতে আসেন, তখন ঘরে কিছু না থাকলেও ধার-কর্জ করে তিনি তাকে আপ্যায়ন করান। সামাজিক দায় দায়িত্বগুলো সবই তিনি পালন করেন। আমি নিশ্চিতরূপেই দেখেছি, মহিলারা নিজের পরিবারের প্রতি অনেক বেশি দায়িত্বশীল। এ জন্যই মহিলাদেরকে সংগঠিত করে তাদের আয়ের ব্যবস্থার কথা সবসময় ভেবেছি।" [১]

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এর শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ প্রতিবেদন বলছে, দেশের শ্রমশক্তিতে থাকা সম্ভাবনাময় সাড়ে ৩৪ লাখ নারীকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না।[২]

আমদের দেশে প্রচলিত অত্যন্ত জনপ্রিয় ধারণা হচ্ছে, কর্মজীবী মায়ের সন্তানেরা ঠিকমতো মানুষ হয় না। এটি শুধু আমাদের দেশের মানুষের ধারণা তা নয়। অনেক পশ্চিমা দেশেও সন্তানদের যে কোন ধরণের ব্যর্থতার কারণ হিসেবে কর্মজীবী মাকেই দোষারোপ করা হতো। কিন্তু হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের ২০১৫ সালের এক গবেষণায় উঠে আসে প্রকৃত বাস্তবতা যে, কর্মজীবী মায়েরা সন্তানের সুষ্ঠু বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় নন বরং মা যদি কর্মজীবী হন তাহলে তার সন্তানদের জীবনে ভালো কিছু করে দেখাবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এক্ষেত্রে কর্মজীবী মায়ের দ্বারা পুত্র সন্তানদের চেয়ে কন্যা সন্তানদের প্রভাবিত হবার সম্ভাবনাই বেশি।

গবেষণাটির প্রাথমিক ফলাফলে বলা হয়েছিল, কোনো কন্যা সন্তানের মা যদি কর্মজীবী হন তাহলে তার ক্যারিয়ারে সফল হওয়া বা খুব ভালো কিছু করে দেখানোর সম্ভাবনা ঐসব কন্যা সন্তানদের চেয়ে বেশি যাদের মা গৃহিণী এবং সারাদিন বাসায় থাকেন। সম্প্রতি গবেষণার পূর্ণাঙ্গ ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা যাচ্ছে, কর্মজীবী মায়েদের সন্তানেরা শুধু যে ক্যারিয়ারেই সফল হয় তা কিন্তু নয়। পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তাদের সুখী হওয়ার সম্ভাবনাও অনেকাংশে বেড়ে যায়।

হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের অধ্যাপক ক্যাথলিন ম্যাকগিন বলেন, "মানুষের মনে এখনও এই ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, মা যদি চাকরিজীবী হন, তাহলে তাতে কোনো না কোনোভাবে সন্তানদের ক্ষতি হতে পারে। তাই আমাদের এই গবেষণার ফলাফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে বোঝাতে যে মায়েদের বাসার বাইরে কাজ করা সন্তানদের ওপর কোন কুপ্রভাব ফেলে না।" তিনি আরও বলেন, "এটি কোনভাবেই সন্তানদের সুখী মানুষ হিসেবে বড় করার সাথে সম্পর্কিত নয়। যখন নারীরা কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়, সেটি তাদের অর্থনৈতিক বা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। তাদের কাজ করার ফলে সন্তানদের কোন ক্ষতি হচ্ছে কি না এটি চিন্তা করা উচিত নয়। কারণ কর্মজীবী মায়ের জন্য সন্তানের আসলেই কোনো ক্ষতি হয় না।"[৩]

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কর্মজীবী হলে দুজনকেই ঘরের কাজে অবদান রাখতে হয় এবং সন্তানদের দেখভাল করতে হয়। তাই কর্মজীবী মায়েদের পুত্র সন্তানেরা ঘরমুখো হন বেশি, পরিবারের সাথে বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকেন। এতো কিছুর পরও কর্মজীবী নারীরা তাদের

সন্তানদের রাখার মতো সুবিধাজনক পরিবেশ-পরিস্থিতি না থাকায় চাকরি ছাড়ছেন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর তথ্য অনুযায়ী ২০১০ সালে শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ৩৬ শতাংশ। ২০১৩ সালে এসে দেখা যায় এই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৩.৬ শতাংশে। শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও শ্রমবাজারে তা কমে যাওয়ায় বিষয়টি উদ্বেগের। [৪]

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ অনুযায়ী, যে প্রতিষ্ঠানে ৪০ জনের বেশি নারী শ্রমিক আছেন, সেখানে ছয় বছর বয়স পর্যন্ত শিশু-সন্তানের জন্য শিশুকক্ষ বা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের জায়গা থাকতে হবে। কিন্তু এ আইন বাস্তবে অনেক প্রতিষ্ঠানেই মানা হচ্ছে না।

দিনশেষে নিজেদের ভাগ্য মিলায়, বন্ধুদের মধ্যে পাঁচ জনের ভাগ্যই সুপ্রসন্ন যে তাদের কর্মস্থলে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র রয়েছে। দুই জন চাকুরি ছেড়েছে বেশ আগেই, তিনজন সহায়তাকারীর সাহায্যে দিন পার করছে কোনো রকমে আর এক জন দ্বিধায় ভুগছে কী করবে? চাকরিটা বুঝি আর রাখতেই পারবে না। তবে কর্মস্থলে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র শুধু থাকলেই হবে না তার সঠিক তদারকি, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সর্বোপরি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়ক কি না সেদিকেও সমান ভাবে খেয়াল রাখতে হবে। তবেই কর্মজীবী মা নিশ্চিন্তে কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে পারবে।

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নামে। বন্ধুদের স্মৃতিমাখা বাস্তব জগৎটাকে পেছনে ফেলে আবার যার যার ঘরে ফেরার তাড়া কাজ করে। সকাল হতেই আবার কর্মব্যস্ততাময় দিন শুরু হবে নিয়ম মেনেই। তবে মা কর্মজীবী কিংবা গৃহিণী, মা তো মা-ই হয়। সবকিছু ছাপিয়ে সকল মায়ের সন্তানেরা পরিবারের দৃঢ় বন্ধনে বেড়ে উঠুক প্রাকৃতিক নিয়মে। ভালো থাকুক সবাই। সুসন্তান হয়ে মানুষ হোক নিজের জন্য, পরিবার-সমাজ-দেশ বা পৃথিবী সবার সঠিক কাজে নিজেকে নিংড়ে দিক আমাদের সন্তানেরা। নিশ্চিতরূপেই আবার দেখা হবে সব বন্ধুদের। আবার গল্পে মেতে উঠবে ওরা এগারোজন। আবারও ভাসবে সন্তানদের সাফল্য গাঁথায় কোনো এক বিকেলে। বেঁচে থাকুক বন্ধুত্ব, ভালো থাকুক সকল মা।

তথ্যসুত্র:

[১] প্রথম আলো, কর্মজীবী মা এবং কিছু কথা, মে ০৯, ২০১৯

[২] প্রথম আলো, সুযোগ-সংকটে হারাচ্ছে সম্ভাবনা, এপ্রিল ২৯, ২০১৯

[৩] এগিয়ে চলো বাংলাদেশ টাইমলাইন; কর্মজীবী মায়ের সন্তানেরাই জীবনে সুখী ও সফল হয় বেশি। মে ২৬, ২০২০

[৪] দৈনিক ইত্তেফাক, চাকরি ছাড়ছেন কর্মজীবী মায়েরা, নভেম্বর ২৬, ২০২২

সংসার

মাসুমা ইবতেকার নাবিলা
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

আমাদের হয়তো প্রেম হয়নি কখনো, তবে একটা সংসার হয়েছিল!

আমাদের সংসারের দোতলার বারান্দা পেরিয়ে চিরল সবুজ পাতার বিশাল গাছ, ওখানটায় আমাদের খুনসুটির জোগানের মতো চড়ুই পাখি লেজ ঝাঁকিয়ে এসে আশ্রয় নিতো বারান্দার কার্নিশ ধরে। ছিমছাম ওই সংসারের ঝিম ধরা দুপুরগুলো অদ্ভুতভাবে মিলিয়ে যেতো কল্পনায়! শোবার ঘরের আলো আঁধারি, আর তোমার জন্য অপেক্ষা মিলেমিশে এনে দিতো রাজ্যের ঘুম! ঘুম ভাঙলেই বিকেলের চায়ের কাপে তোমার বাদামী চোখের আলো দেখতে পেতাম।

মিরপুরের রোড ধরে রাত করে হাঁটতে গিয়ে পেঁয়াজ কিনতে যাওয়ার সময় যে পরম নির্ভরতায় আমি তোমাকে সংসার ভেবে হাত বাড়িয়েছিলাম, একবারও ভুল করেও মনে হয়নি ওটা আমার অলীক কল্পনা! রাতে দোতলার সংসারে ফিরে গলদা চিংড়ির মালাইকারি আর নরম ধোঁয়া উঠা সাদা ভাতে আমার সমস্ত পৃথিবী খুশি হয়ে যেত। তোমাকে কখনো ঘুমের ঘোরের দুঃস্বপ্ন মনে হয়নি, যাকে ঘুমের ভেতরেই তাড়ানোর প্রবল ছটফটানি আঁকড়ে ধরবে! বরং মায়ের মতো পরম নির্ভরতায় বাদামী চোখের মানুষটার স্পর্শে দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলাম!

'ঘুম রেস্তোরাঁ' বলে কল্পনার যে কফিশপটা আছে আমার, আদতে আমরা সে রেস্তোরাঁর কাস্টমার। সপ্তাহান্তে সংসারের খুঁটিনাটি আলাপ করতে করতে কফি কাপে চুমুক দিয়ে আসলে আমি আমাকে আড়াল করতে চাইতাম তোমার বাদামী চোখ জোড়ায়! ঘুর্নাক্ষরেও ভাবিনি সংসারে ফিরে গিয়ে দেখব, শূন্য বারান্দা শীতলতম মন নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে!

আমার ছোটোখাটো সংসারের প্রতিটা আনাচে কানাচে তুমি মিশে ছিলে, কখনো অসম্ভব কল্পনায় আলাদা করতে পারিনি! আমাদের কল্পনার সংসারটা যে আদতে কল্পিতই রয়ে যাবে, আমি চাই নি।

তোমার সাথে বৃদ্ধ হওয়ার তীব্র ইচ্ছেটা বুকের ভেতর পুষে রাখতে রাখতেই বয়েস আমার ষাটের কোটা পেরিয়ে এলো। এতটাও অলীক ভাবনা ভাবতে চাইনি, যাতে একটা শূন্য সংসারের মায়া, একটা কল্পনা নিঃশেষ করে দিবে আমার অর্ধেক জীবনীশক্তি, এই কথাটাও সেই বয়েসে কখনো চিন্তা করতে পারি নি..

আমার না হওয়া সংসার, কতটা শূন্য হয়ে আছো তুমি?

বেলা শেষের গল্প

এস এম নাফিজ উল আলম
শিক্ষার্থী
এমবিএ (প্রফেশনাল)

বেশ কিছুদিন যাবৎ শরীরটা খুব খারাপ অর্পির। মন মেজাজ সবসময় বিগড়ে থাকে তাঁর। একদিন বিকেল বেলায় বিগড়ানো মেজাজ নিয়ে গিয়ে বসেছেন ডি.সি. হিল পার্কে। বিষাদমাখা রোদ্দুরে বড় বড় রেইনট্রির নিচে বসে তিনিও যেন অমলকান্তির মতো প্রাণপণে রোদ্দুর হতে চাইছিলেন। ঠিক তখুনি তাঁর পাশ ঘেঁষেই বসে আছে এক তরুণ। মন খারাপের এই তীব্র বিষাদমাখা বিকেলে এমন একজন অনাহুতের উপস্থিতিতে খুব বিরক্ত হলেন তিনি। চোখেমুখে স্পষ্ট বিরক্তি ছড়িয়ে বললেন, 'আমায় কিছু বলবেন? কে আপনি?' 'তাঁর বিরক্তিকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে খুব সপ্রতিভভাবেই সে উত্তর দিল, 'রুদ্র।' অর্পি কপাল কুঁচকে বললেন, 'আমি কি আপনাকে চিনি? এভাবে আমার পাশে এসে বসেছেন কেন?'

ছেলেটি খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললো, 'খারাপ কোনো উদ্দেশ্য নেই। আপনার সাথে কথা বলতে এলাম। সাধারণত আপনার বয়সী মহিলারা তো পার্কে আসে হাঁটতে। কিন্তু আপনি কাল এবং আজ দু'দিনই পার্কে এসে বসে পড়লেন, এবং দুদিনই লক্ষ্য করলাম, আপনি গভীর বিষন্নতায় ডুবে গিয়ে একদৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। আপনি কি কোনো কারণে হতাশায় ভুগছেন?'

খুব অবাক হলেন অর্পি অপরিচিত এই তরুণের গায়ে পড়া স্বভাব দেখে। ছেলেটা যদিও খারাপ কিছু বলেনি, তবুও কেন যেন প্রচণ্ড রাগ হলো ওর উপর। চেনে না, জানে না, অমনি এক অপরিচিত মহিলাকে একা পেয়ে ভাব জমাতে চলে এলো! তাঁর সাথে এমন গায়ে পড়া আচরণ করছে, না জানি কিশোরী দেখলে কেমন করে। মনে মনে ভাবলেন, একটা উচিত শিক্ষা দিতে হবে ছেলেটাকে, তাই তিনি বললেন, 'আপনি কি বাংলাদেশের যাবতীয় একা চলা নারীর এভাবে খোঁজ খবর নেন?' ছেলেটা, অর্পির ব্যঙ্গ ধরতে পারলো, না পারার তো কোনো কারণ নেই। কারণ তিনি কণ্ঠে যতটা পারেন শ্লেষ মিশিয়েছেন।

'হুম, তা বলতে পারেন মোটামুটি। আমি আপনার মতো এরকম কোনো শিক্ষিতা মহিলাকে রাস্তাঘাটে একা চলতে দেখলে সহায়তার জন্য এগিয়ে আসি।' মনে মনে হাসলেন অর্পি। তিনি স্বরকে কঠিন করে বললেন, 'ধন্যবাদ। আপনার সহায়তা আমার লাগবে না। আমাকে একটু একা থাকতে দিন প্লিজ।' রুদ্র আচ্ছা বললো বটে, কিন্তু অর্পির পাশ থেকে উঠলো না। অর্পি ওকে প্রাণপণে উপেক্ষা করতে চাইলেন, কিন্তু অসুস্থ শরীর মেজাজকে খিটখিটে বানিয়েছে অনেক আগেই। একবার ভাবলেন উঠে যাবেন। পরক্ষণেই মনে হলো তিনি উঠে গেলে ছেলেটা ভাববে তিনি ওকে ভয় পেয়েছেন। এদিকে তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। রুদ্রের দিকে নজর দিতে গিয়ে কখন যে তাঁর অমলকান্তি মার্কা রোদ উধাও হয়ে গেছে খেয়ালই করা হয়নি। চারপাশের লোকজন ততক্ষণে ঘরমুখো। অর্পির মনে হলো, এবার বুঝি তিনি একটু একলা থাকতে পারবেন, নিশ্চয় এই ছেলেটিও এবার ঘরে ফিরবে কিন্তু সন্ধ্যা সরে গিয়ে রাত নেমে এলেও ছেলেটির জায়গা ছাড়ার কোনো লক্ষণ দেখতে পেলেন না তিনি।

মশার জন্য বসা দায় হলো, তাই পা দুটোকে শাড়ির নিচে আড়াল করতে চাইলেন অর্পি। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি বলে উঠলো, 'আজ আর না, এবার বাসায় যান। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিই।' ছেলেটির ধৃষ্টতা দেখে অর্পি হতবাক হয়ে গেলেন। কোন সাহসে সে তাঁকে বাসায় পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে? ইচ্ছে হলো কষে একটা চড় মারতে ওর গালে। তারপর ছেলেটার দিকে ফিরে সোজাসুজি চোখের দিকে তাকিয়ে ইচ্ছে করেই তুমিতে নেমে আসলেন, 'আশ্চর্য! তুমি সীমা ছাড়াচ্ছো কেন? আমার সাথে তোমার চেনা

নেই, জানা নেই, অথচ সেই বিকেল থেকে তুমি আমার পাশ থেকে নড়ছো না। আমাকে এভাবে বিরক্ত করছো কেন? বলতে গেলে তুমি আমার ছেলেরই বয়সী, মায়ের বয়সী এক মহিলাকে বিরক্ত করতে তোমার লজ্জা লাগছে না?'

রুদ্র অর্পির দিকে তাকিয়ে হাসলো, তারপর বললো, 'মায়ের বয়সী বলেই তো লজ্জা পাচ্ছি না। উঠুন তো, বাসায় চলেন। আমি আপনাকে আপনার বাসায় পৌঁছে দেবো। এতরাতে এখানে বসা ঠিক হবে না।' তারপর একটু থেমে বললো, 'আর কিছু না হোক, জঙ্গল থেকে সাপও নেমে আসতে পারে।' সাপের কথা বলার সাথে সাথে পিঠের শিরদাঁড়া বরাবর যেন একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেলো অর্পির, বিষণ্নতা এবং ক্রোধ যেন ভীতির কাছে হার মানলো। যদিও রুদ্রকে সেটা বুঝতে দিলেন না, তবুও অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালেন এবং হাঁটাও শুরু করে দিলেন। তাঁর পাশাপাশি রুদ্রও হাঁটছিল। তিনি রিক্সা ডাকতেই রুদ্রও তাঁর সাথে উঠতে চাইলো রিক্সায়। অর্পি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি কোথায় যাচ্ছো? আমার সাথে তোমাকে যেতে হবে না। আমি একাই চলতে পারি।' রুদ্র অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে অর্পির দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনি বাসায় যাবেন তো? অন্য কোথাও চলে যাবেন না তো?' অর্পি আসলেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না রুদ্রকে। এ ছেলে তাঁর পিছু লেগেছে কেন? ও কী চায় তাঁর কাছে? তাঁকে বাসায় পৌঁছে দিতে ওর এত আগ্রহ কেন? তিনি ওর চোখে চোখ রাখলেন, গভীরভাবে পড়ে নিতে চাইলেন ওর দৃষ্টি, কিন্তু কেন যেন মনে হলো ওর চোখে নেই কোনো অসৎ বাসনা, বরং রয়েছে অপরিসীম উৎকণ্ঠা।

ওর দৃষ্টির কারণে কি না জানি না, হঠাৎ করেই রুদ্রর প্রতি কণ্ঠটা নরম হয়ে গেলো অর্পির বললেন 'তুমি কি আমাকে বলবে, আসলেই তুমি কে? আমাকে নিয়ে এত ভাবছোই বা কেন?' রুদ্রের চোখে কি একটু জল দেখতে পেলেন অর্পি। একটু কি ঠোঁট কেঁপে উঠলো ওর। তেমনটাই মনে হলো তাঁর। ততক্ষণে রুদ্র নিজেকে সামলে নিয়েছে, বললো, 'আসলে আমার মায়ের কথা মনে পড়েছিল আপনাকে দেখে। আমার মা হারিয়ে গেছেন দু'বছর আগে।' 'হারিয়ে গেছেন মানে মারা গেছেন?' অর্পি কিছুটা শঙ্কা নিয়ে বললেন।

'না, ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। যাবার আগে একমাস ধরে সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন মা। ডাক্তার বলেছিলেন উনাকে চোখে চোখে রাখতে। কিন্তু তখন আমরা সবাই নিজেকে নিয়ে এতটাই ব্যস্ত ছিলাম মায়ের দিকে অতটা নজর দিইনি। একদিন বাইরে থেকে বাসায় ফিরে দেখি মা বাসায় নেই। মা কখন বেরিয়ে গেছেন। এরপর অনেক খুঁজেছি মাকে। কিন্তু এখন পর্যন্ত মাকে আর পাইনি।'

অর্পি স্তব্ধ, এমনকিছু শোনার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না মোটেও। রুদ্র বললো, গতকাল আর আজকে আপনার মধ্যে আমি যেন আমার মাকেই দেখতে পেলাম। সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার আগে মাও আপনার মতো একা একা একদিকে তাকিয়ে বসে থাকতেন। তাই আপনাকে দেখে মনে হলো আপনিও মায়ের মতো নিঃসঙ্গতায় ভুগছেন।

রুদ্র যখন কথাগুলো বলছিল, তখন ওর চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল তীব্র আত্মগ্লানি। ওর সেই 'গ্লানিমাখা মুখ অর্পির দু'চোখকেও কখন যে অশ্রুসিক্ত করে দিয়েছে তা তিনি টেরই পাননি। একটু আগেই তিনি ছেলেটা সম্পর্কে যাচ্ছেতাই ভাবছিলেন, তার চরিত্র নিয়েও শংকিত ছিলেন, অথচ বুঝতেই পারেননি তাঁরই চোখে বখে যাওয়া তরুণটি তখন তাঁরই কথা ভেবে উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁরই পাশে অবস্থান নিয়েছিলো। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হচ্ছিলো অর্পির, রুদ্রের গ্লানি কি তবে তাঁকেও স্পর্শ করলো। সব দ্বিধাকে ঝেড়ে ফেলে অর্পি রুদ্রকে বললেন, 'চলো, আমাদের বাসায় চলো।' রুদ্র মুচকি হাসলো, তারপর কী যেন ভেবে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'না, আজ না।' বলেই হনহন করে হেঁটে রোডের দিকে চলে গেলো। ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ অর্পি দেখতে পেলেন তাঁর ঘর তাঁকে ডাকছে। তাঁর ছেলেও হয়তো এতক্ষণে মায়ের খোঁজে পথে নেমেছে, কারণ তিনি তো আসার সময় ইচ্ছে করে মোবাইল ফোনটিও বাসায় রেখে এসেছেন।

লাবণ্যের লতা

জাওহারা রহমান জর্জিয়া
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব সোশিওলজি

আমার কলেজের পাশে মধ্য বয়সী এক লোক ভ্যান গাড়িতে করে শরবত বিক্রি করতেন। নাম রফিক। সবাই বলতো রফিক ভাই। চমৎকার শরবত বানাতেন তিনি। অফিস পাড়ার সবাই ভিড় করে তার শরবত খেতো।
লাঞ্চের সময় কিংবা অফিস শেষে রফিক ভাইয়ের ভ্রাম্যমাণ দোকানে শরবত খেতে গেলে তার সাথে অল্প স্বল্প কথা হতো। তিনি কেবল ভালো শরবতই বানাতেন না, মানুষ হিসেবেও ছিলেন ভালো। সব সময় তার মুখে লাজুক হাসি লেগে থাকতো।
"রফিক ভাই, কেমন আছেন?"
"জী স্যার, ভালো আছি।"
"আপনাকে কতোবার বললাম, আমাকে স্যার বলবেন না। বয়সে আমি আপনার ছোটো।"
তিনি লাজুক হাসতেন। মুখে কিছু বলতেন না। তিনি আমার মতো আরো অনেককে স্যার বলতেন।

তারপর বলতাম, "বাসার সবাই ভালো আছে?"
"জী স্যার, ভালো আছে।"
যদিও তার বাসার মানুষদের কথা জিজ্ঞেস করতাম, মূলত আমি জানতাম না, তার পরিবারে কে কে আছে। ঐ ব্যাপারে তাকে কখনো প্রশ্ন করিনি।

প্রতিবার শরবত খাওয়ার পর রফিক ভাইকে বলতাম, "এতো চমৎকার শরবত কী করে বানান, বলুন তো?"
তিনি লাজুক হেসে বলতেন, "আমার কোনো ক্ষমতা নাই। সব আল্লাহর দান।"
দক্ষতা নিয়ে তার মধ্যে কোনো অহংকার ছিলো না।
মাস তিনেক পর দেখলাম রফিক ভাই যেখানে শরবত বিক্রি করতেন, সে জায়গাটা খালি পড়ে আছে। একদিন দুদিন নয়, টানা এক মাস জায়গাটা খালি পড়ে থাকলো।

তারপর একদিন রফিক ভাইয়ের ভ্যান গাড়িটিকে নির্দিষ্ট জায়গায় আবারো দেখা গেলো। তবে অবাক হয়ে দেখলাম, সেখানে রফিক ভাই নেই। শরবত বিক্রি করছে দশ এগারো বছরের ছোট্ট একটি মেয়ে।
ব্যাপারটা কী? পরে মেয়েটির কাছ থেকে জানতে পারলাম, রফিক ভাইয়ের না থাকার কারণ।
ঘটনাটি মর্মান্তিক। হঠাৎ করে রফিক ভাই স্ট্রোক করলেন। এখন অবশ শরীর নিয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। আর এই মেয়েটি হলো রফিক ভাইয়ের একমাত্র মেয়ে। মেয়ে আর বাবা ছাড়া এদের কেউ নেই। বছর দুয়েক আগে মেয়েটির মা মারা যায়। রফিক ভাই এরপর আর বিয়ে করেননি। সংসারের হাল ধরার মতো কেউ ছিলো না। তাই বাধ্য হয়ে ছোট্ট মেয়েটিকে বাবার চিকিৎসা এবং সংসারের খরচের জন্য পড়াশোনা ছেড়ে উপার্জনে নামতে হলো। সে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী ছিলো।
বাবার মতো সেও চমৎকার শরবত বানাতো। হয়তো বাবা শিখিয়েছেন কিংবা বাবাকে দেখে শিখেছে।
মেয়েটি ছোটো বলে ভ্যান গাড়িটিকে ঠেলতে পারতো না। তাই রফিক ভাইয়ের পরিচিত এক লোক প্রতিদিন সকালে ভ্যান গাড়িটিকে ঠেলে নিয়ে আসতো। আর দিন শেষে ঠেলে ঘরে নিয়ে যেতো। আর মেয়েটি সারাদিন একা একা শরবত বিক্রি করতো।

ছোট্ট মেয়েটিকে যতোবার দেখতাম ততোবার বুকটা হুহু করে উঠতো। ওর এখন স্কুলে যাওয়ার সময়, বন্ধুদের সাথে খেলার সময়, অথচ তা না করে, সে এখন জীবনের সাথে লড়ছে।

যদি আমার ক্ষমতা থাকতো তাহলে রফিক ভাই এবং মেয়েটার যাবতীয় খরচের দায়িত্ব নিতাম। মেয়েটাকে পুনরায় স্কুলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতাম। কিন্তু তা পারতাম না বলে মনটা বিষণ্ন হয়ে থাকতো।
একদিন আমার এক বন্ধুকে রফিক ভাই এবং তার ছোট্ট মেয়েটির কথা বললাম। এবং তাদের জন্য কিছু করতে না পারার কষ্টের কথা বললাম।

সব শুনে সে বললো, 'কাল অফিস থেকে আসার সময় মোবাইলে মেয়েটার কিছু ছবি তুলে আনবে।'
আমি তাই করলাম। পরদিন মেয়েটির শরবত বিক্রি করার মুহূর্তের কয়েকটা ছবি তুললাম।
বন্ধু সেই ছবিগুলো দিয়ে ফেইসবুকে একটা পোস্ট করলো। সেখানে লিখলো রফিক ভাইয়ের স্ট্রোক করা এবং নিরুপায় হয়ে ছোট্ট মেয়েটির পড়াশোনা ছেড়ে সংসারের হাল ধরার কথা।

তারপর যা হলো, তা অসাধারণ বললেও কম বলা হবে। পোস্টটিতে মানুষেরা অভাবনীয় সাড়া দিলো। তখন আমি বুঝলাম, এতো এতো খারাপের ভিড়ে ভালো মানুষের সংখ্যাও কম নয়। একাধিক স্বচ্ছল ব্যক্তি রফিক ভাই এবং তার মেয়ের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এলো। শুধু তাই নয়, স্থানীয় প্রশাসনও তাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলো।
প্রশাসন থেকে তাদের জন্য নতুন বাড়ি তৈরি করে দেয়া হলো। আর স্বচ্ছল ব্যক্তিরা রফিক ভাই এবং তার মেয়ের দায়িত্ব নিলো। একজন বললো, মেয়েটা পড়াশোনা শেষ করলে তাকে চাকরিও দেবে।
সুচিকিৎসা পেয়ে রফিক ভাই দ্রুত সেরে উঠতে লাগলেন। আর মেয়েটা ক্লাসে চমৎকার রেজাল্ট করে এগিয়ে যেতে লাগলো। মেয়েটা এখন শহরের নাম করা একটা স্কুলে পড়ছে।
রফিক ভাই একদিন চোখের পানি ফেলে আমাকে বললেন, 'স্যার, আপনি আমাদের জন্য যা করেছেন তার ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারবো না।'

বললাম, 'আমি আপনাদের জন্য কিছু করিনি। আমার বন্ধুর জন্য এসব সম্ভব হয়েছে।'
তিনি তখন মিনতি করে বললেন, 'তাকে একদিন এই নতুন বাড়িতে নিয়ে আসবেন। খুব খুশি হবো।'
এরপর ওকে একদিন রফিক ভাইয়ের নতুন বাড়িতে নিয়ে গেলাম।
ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে রফিক ভাই এবং তার মেয়ে পায়ে ধরে সালাম করতে ছুটে এলো। বন্ধু তাদের থামালো।
তারপর মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে রফিক ভাইকে বললো, 'রফিক ভাই, জলদি সুস্থ হন। আপনার হাতের শরবত খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে আছি। কি খাওয়াবেন তো?'

রফিক ভাই তার চিরায়ত লাজুক হেসে উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়ই।'

বন্ধুত্ব

ইমরানুল হক চৌধুরী
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ

পাতার খসখস শব্দে চমকে উঠলো রাকিব। এমনিতে সাপের উপদ্রব, তার মাঝে রাতের অন্ধকার। চাঁদের আলো থাকলেও, এখন মেঘে ঢাকা। ও দাঁড়িয়ে আছে পুরোনো রাজবাড়ীর সামনে-একা।

কাছেই ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিলো পরিচিত একটা মুখ-সৌমিক। হাপ ছেড়ে বাঁচলো ও। "কি রে এতক্ষণ লাগলো তোর?"

"...স্কুল ছুটির পর...," কি যেন বিড়বিড় করলো সৌমিক, বোঝা গেলো না।

সকালে স্কুলের একটি ঘটনার কারণে ওরা এখন এই পুরোনো রাজবাড়ীর সামনে। নিশিন্দাপুরের এই রাজবাড়ীটা নিয়ে অনেক কাহিনি প্রচলিত আছে। রাজা রায়বাহাদুর খাজনার টাকা আদায় করতে না পারলে, রাজবাড়ীর ভেতরেই প্রজাদের অত্যাচার করতেন। অসহনীয় অত্যাচার সইতে না পেরে অনেকে মরে যেত। পাশেই কদমা নদীতে ফেলে দেয়া হতো লাশগুলো।

সে সব পুরোনো কথা। এখন সে রাজাও নেই, তার বংশধরও নেই। পরিত্যক্ত বাড়িটার একটা অংশ ধসে পড়েছে। পলেস্তার খসে পড়েছে বিভিন্ন জায়গায়। আগাছা গজিয়ে আছে ইটের ফাঁকে ফাঁকে। দেখলেই গা ছমছম করে।

এত কিছুর পরেও বাড়ির মূল ঘরটা এখনো টিকে আছে। সেখানে এক সাধুর বাস। ওনাকে ঘিরেই আজ সকালের কাহিনি। রাকিব স্কুলে খুব বড়াই করে বলছিল, "ওসব ভূত-ফূত বলে কিছু হয় না। আমি ভয় পাই না ওসবে।"

রাকিবের বেস্টফ্রেন্ড সৌমিক। বন্ধু যখন বলেছে কথাটা, তখন সে সুর না মিলিয়ে কীভাবে থাকে! "হা। ওসব ভূতের ভয় শুধু মনের ভেতরেই। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

"ঠিক আছে। তাহলে প্রমাণ দে যে তোরা সাহসী," শুভ্র বলে উঠলো। "রাজবাড়ীতে সাধু যেখানে উপাসনা করে, ওখানে একটা লাল কাপড় বাঁধা আছে। বাইরে থেকে দেখা যায়। তোর কাজ হচ্ছে রাতের বেলা কাপড়টা চুরি করে আনা।"

ক্লাসের সবাই উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। চকিতে একবার দীপার দিকে তাকিয়ে নিলো রাকিব। মনে মনে পছন্দ করে ওকে। তারও চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। এখন পিছিয়ে গেলে মান-সম্মান বলে কিছু থাকবে না রাকিবের। ইতস্তত করছে।

ঘটনা বুঝে গেল সৌমিক। "কাজ হয়ে যাবে। কালকেই লাল কাপড়টা পেয়ে যাবি তোরা। প্রমাণ হয়ে যাবে সব।" সৌমিকের কথায় রাকিব একটু ভরসা পায়।

শলাপরামর্শ করলো দুজনে, গভীর রাতে আসবে ওরা। সাধু ততক্ষণে ঘুমিয়ে থাকার কথা। এ সুযোগেই লাল কাপড়টা লোপাট করতে হবে।

"রেডি!" সৌমিককে জিজ্ঞেস করলো রাকিব।

"চল।" বলেই হাঁটা শুরু করলো সৌমিক।

"আস্তে হাঁট। সাধু জেগে গেলে সমস্যা হবে। আর সাপখোপেরও ব্যাপার আছে।"

"আমি থাকতে তোর এত কীসের ভয়?" সৌমিকের ঝটপট উত্তর। তবে রাজবাড়ীর ফটকের সামনে গিয়েই থেমে গেলো ও। ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ থাকার ইঙ্গিত করলো রাকিবকে।

ভেতরে সাধুকে দেখা যাচ্ছে। নড়াচড়া নেই। ঘুমিয়ে আছে সম্ভবত। তার একটু পাশেই একটি লাঠির মাথায় লাল কাপড় বাঁধা। তবে ভেতরে কেমন যেন উৎকট গন্ধ-মাথা ধরে যায়।

"আমি পা টিপে টিপে ভেতরে গিয়ে কাপড়টা নিয়ে আসছি," ফিসফিস করে বললো রাকিব।

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালো সৌমিক। "গেলে একসাথে যাবো। কি হয় বলা যায় না।"

দুজনে এরপর সাবধানে পা পেলে সামনে আগাতে থাকে। কাপড়টার খুব কাছাকাছি চলে গেছে ওরা।

সাধু এখনো কিছু টের পায়নি। হাতের ইশারায় রাকিবকে কাপড়টা বাঁধন থেকে খুলে নিতে নির্দেশ দিলো সৌমিক। রাকিব দ্রুত হাত চালাতে লাগলো। দুজনের মনোযোগ ঠিক ওখানেই।

রাকিবের হাতে চলে এসেছে লাল কাপড়টা। খুশি হয়ে পেছনে ঘুরতেই ভয়ে চমকে উঠলো। সৌমিকের পেছনে সাধুকে দেখা যাচ্ছে। কখন যে ঘুম থেকে উঠেছে টের পায়নি ওরা। টকটকে লাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সৌমিকও বিষয়টা আঁচ করতে পেরে পেছনে ঘুরলো। সাধুর নজর পড়লো ওর উপর। লোকটা ভয়ে কুঁকড়ে গেলো কেন জানি-ঘোর লাগা দৃষ্টি।

"ওমাগো," হঠাৎ চিৎকার দিলো সাধু। ছুটে পালালো। রাকিব যেন জায়গায় জমে গেছে। সৌমিক ওর হাত ধরে টানতে লাগলো। "চল পালাই এখান থেকে"।

দুজনে প্রায় অন্ধের মতো ছুটতে লাগলো ঝোপঝাড় ভেঙ্গে। নিজেরাও ভয় পেয়েছে। সাধু যে আবার কখন কি করে!

"সাধু ওভাবে ভয় পেয়ে গেলো কেন?" জানতে চাইলো রাকিব।

"গাঁজা খেয়ে মাথা নষ্ট হয়ে গেছে মনে হয়। ভেতরে গন্ধ পাসনি!" উত্তর সৌমিকের।

কদমা নদীর তীরে পৌঁছে গেছে দুজনে। থামলো এবার। হাঁপাচ্ছে ভীষণ। রাকিবের হাতে তখনো লাল কাপড়টা। হাতছাড়া করেনি কোনোভাবে। মান-সম্মানের জিনিস তার।

নদীর পাড়ে ভীষণ বাতাস। প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে ওদের। রাকিব ধপ করে বসে পড়লো বালির উপর। "আর দৌড়াতে পারবো না। সব এনার্জি শেষ," বললো সে।

সৌমিক তখনও দাঁড়িয়ে। বুক ভরে নদীর পাড়ের বাতাস টেনে নিচ্ছে। বসলো এবার। "মিশন সাকসেসফুল। কি বলিস? এবার দীপার চোখেও তুই হিরো। হি হি।"

লজ্জায় লাল হয়ে গেলো রাকিব। "কি যে বলিস না!"

"বোঝা যায় অনেক কিছুই। শোন, সবকিছুর মাঝেও যেন আমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকে," বলে সৌমিক চিৎ হয়ে বালির উপর শুয়ে পড়লো। হাত মাথার নিচে। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

"অবশ্যই থাকবে," বললো রাকিব। সেও চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে মনে খুব খুশি ও।

"মানুষ মরে গেলে কি হয় তুই জানিস?" হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে বললো সৌমিক। ওর কথার ধরনটা কেমন যেন!

"শুনেছি, তারা হয়ে যায় আকাশের। আমার দাদি বলেছিল ছোটবেলায়," বললো রাকিব।

"এত তারার ভেতরে তুই আমাকে কি করে খুঁজে পাবি?" সৌমিকের কণ্ঠে বিষণ্নতার ছোঁয়া।

সৌমিকের অদ্ভুত কথাগুলো রাকিব বুঝতে পারছে না। বললো, "তুই তো মরে যাসনি। এখন এসব কথা রাখ। বাড়ি যাই চল!"

"আর কিছুক্ষণ থাকি," জোরে একবার বাতাস টেনে নিলো সৌমিক। "যদি নদীর পাড়ের বাতাস খাওয়ার সুযোগ না পাই আর!"

রাকিব কিছু না বলে চুপ করে রইলো। তারও এই নিস্তব্ধতা সাথে বাতাস ভালো লাগছে। কিছুক্ষণ উপভোগ করা যায়। অনেকক্ষণ দৌড়ানোতে ক্লান্ত ভীষণ। মনে হচ্ছে অনন্ত অন্ধকারের ভেতরে যেন ডুবে যায়। চোখ বন্ধ রাখলো। মৃদুমন্দ বাতাসে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লো, টের পেলো না।

***

কে যেন জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে রাকিবকে। "এই রাকিব ওঠ ওঠ। তুই এখানে কী করছিস?"

পরিচিত কণ্ঠ শুনে চোখ খুলে তাকালো। ওর বাবা ডাকছে। চেহারায় চিন্তার ছাপ। পাশে শুভ্র আর দীপা দাঁড়িয়ে। ওরাও চিন্তিত। আশেপাশে কিছু লোক জড়ো হয়ে আছে। কিন্তু, রাকিবের নজর সৌমিকের খোঁজে। কোথাও নেই! রাকিবের হাতে তখনও লাল কাপড়টা।

"সৌমিক কোথায়?" জানতে চায় রাকিব।

"তোরা কালকে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথেই সৌমিককে সাপে কেটেছে। তুই তো জানিস না। ওকে নিয়ে মেডিকেলে ছোটাছুটি করছিল ওর বাবা-মা, আমিও ছিলাম। আর এদিকে তোকে খবরটা জানাতে গিয়ে দেখি তুইও বাসায় নেই।"

"মানে?" রাকিবের মাথায় কিছু ঢুকছে না।

"অনেক খুঁজলাম তোকে। সৌমিক বারবার তোকে দেখতে চাইছিল। পরে শুভ্রদের বাসায় গিয়ে শুনলাম তোদের রাজবাড়ীর কাহিনি। এত সাহস তোর? একা একা ওখানে গিয়েছিস! লোকজন নিয়ে খুঁজতে বের হয়েছি।"

রাকিবের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। একা একা কোথায়! কালকের পুরোটা সময় সৌমিক ওর সাথে ছিল। এসব কি? "সৌমিকের কী অবস্থা?" জানতে চায় রাকিব।

"উপজেলায় অ্যান্টিভেনম ছিল না। নিরুপায় ছিলো সবাই।" কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো রাকিবের বাবা।

রাকিবের চোখ গড়িয়ে জল পড়তে লাগলো। মনটা কষ্টে দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে। রাতে ওর সাথে সৌমিকই ছিল, তাই বিশ্বাস করতে চায় ও। বন্ধুত্বের টানেই ফিরে এসেছিলো সৌমিক। শেষবারের মতো দেখা দিয়ে গেছে!

পরম নির্ভরতা

মোহাম্মাদ তামজিদ আব্দুল্লাহ
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

পৃথিবী পেরিয়ে একটু দূরে ...মঙ্গল থেকে আরো দূরে। ইউরেনাস, নেপচুন থেকেও দূরে ... গ্রহগ্রাম থেকে আরো দূরে। একটা প্ল্যানেট আছে। ছোট্ট প্ল্যানেট।

ওখানে ক্যাচাল নেই। যুদ্ধ নেই। ড্রোনের শব্দ নেই। মিসাইলের সাইরেন নেই। যেখানে চুপচাপ জীবন কাটানো যায়। আয়েশে বছর পেরনো যায়। আয়েশে হায়াত ফুরানো যায়।

কেউ জানে না। কেউ খুঁজে না। কেউ ডেকে পাশ ফেরায় না। কেউ যমদূতের ভয় দেখায় না। চোখবুঁজে। শোকমুছে। চুপিসারে। চির নির্ভারে বছর, যুগ, শতাব্দী পেরিয়ে দেয়া যায়।

আচ্ছা এমন নির্ভার, নিরাপদ জায়গা কি আদৌ আছে? গুগলে খুঁজলে দেখাবে?
কেউ পেয়েছে? কেউ দেখেছে? কেউ গিয়েছে?
আমি ঠিক জানি না। আমার জানার বাইরে। কখনো যাইনি। তবে যাবার আগ্রহও নেই।
ও প্ল্যানেটটা আমার কাছেই তো আছে। আমার ঘরে... আমার ফর্দে.... আমার তালিকায়.... আমার হৃদপিণ্ডের ঠিক মাঝখানে।
আমি যখন দুষ্প্রাপ্য নির্ভরতার খোঁজে গ্রাম থেকে গঞ্জে ছুটছি, তখন সে আমার পুরো শহরটাই একা হাতে খুব যত্নে আগলে রেখেছে।
আমি যখন অনিশ্চিত সময়ে দাঁড়াবার একমুঠো জমি খুঁজছি, তখন সে নিরাপত্তার বলয়ে আমার আস্ত বাগানটাকেই সাজিয়ে রেখেছে।
আমি যখন বাঁচবার চেষ্টায় দিগ্বিদিক পালিয়ে বেড়াচ্ছি, তখন সে আমার ছোট্ট তাসের ঘরটাকে সুন্দর করে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।
তাঁর ব্যাপারে লিখতে গেলে মোটা মোটা সাইজের ডজনখানেক খাতা আর গণ্ডাখানেক কলম নিয়ে বসলেও এরকম আরো কিছু নির্ভরতার উদাহরণ বাদ পড়ে যাবে। আরো কিছু নিরাপত্তার কথা চাপা রয়ে যাবে। আরো বহু নিশ্চিন্তের প্রহর উঁকি দিয়ে যাবে।

সে আমার শুরুতে বলা ঐ প্ল্যানেটটার মতোই।
সব বাঁধা পেরিয়ে। সব জ্বালা ছাড়িয়ে। সব ভয় এড়িয়ে তাঁর কাছে গেলেই মনে হয়,
যাক বাবা। এবার অন্তত আর চিন্তা নেই।
চশমা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? সে আছে।
জরুরি কিছু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? সমস্যা নেই। সে আছে।
জ্বর এসেছে?
আরে সে আছে তো।
ভাত এখনো রান্না করা হয়নি?
আরে বাবা সে আছে তো নাকি! একটা ব্যবস্থা ঠিকই হয়ে যাবে।
মোদ্দাকথা, সে আমার এক জীবন্ত সলূশনবক্স। সে আছে; মানে ইনফিনিটি অংকেরও উত্তর আছে।
সে আছে। মানে আমার পুরো পৃথিবীটাই আছে।

আমি লাক ফ্যাক্টরে খুব বড় রকমের বিশ্বাসী।
রোজ ঘুম ভেঙ্গে দেয়া একজনকে পাওয়ার জন্য ভাগ্যকে ভক্তি করি।
বাউণ্ডুলেপনা ভরা একটা জীবনকে সুন্দর করে সাজানোভাবে পাওয়ার জন্য ভাগ্যকে প্রণাম করি।
আর দিনেদুপুরে ডাকাতি করে, জীবন নামক দুর্মূল্যের বাজার থেকে একটা অমূল্য হীরে বিনা মূল্যে পাওয়ার মত তাকে জীবনে পাওয়ার জন্যে ভাগ্যকে রোজ সালাম করি। এটা ভাগ্যই তো। ভাগ্যই, নাকি?
না হলে এরকম একজন মানুষকে জীবনে পাওয়া কি আর শতাব্দীর অপেক্ষাতেও পাওয়া যায়?

কয়েকযুগ কেটে গেছে। সুখের দিন আয়েশে গেছে। খুব ভয় লাগে। খুব অসহায় লাগে। খুব খাপছাড়া মনে হয়। যখন কিনা সে ছাড়া আমার ভাঙ্গা তাসের ঘর আমার কল্পনায় ভাসে।
আচ্ছা কী হবে সেদিন? কী হবে যখন সে ছাড়া জানালার পর্দাটা বাতাসে উড়বে?
কী হবে যখন তাঁর বসার চেয়ারটায় ধূলা জমে যাবে?
কী হবে যখন তাঁর ওড়নার সুগন্ধ স্মৃতিকে দোলা দিয়ে যাবে?
কী হবে? যখন...... নাহ্ ... আর ভাবা যায় না।

শুধু এটুকুই ভাবি। আর মনে মনে জপ করে বলি.....
মা,
তুমি দয়া করে এভাবেই থেকো,
শীতের রাতে উষ্ণ উলের কম্বোল হয়ে।
মা,
তুমি এভাবেই থেকো,
আমার এই ছোট্ট তাসের ঘরে একগুচ্ছ পরম নির্ভরতা হয়ে।

বাবা এবং মেয়ে

তাসনুভা রহমান লাবিবা
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব সোশিওলজি

আমার যখন তিন বছর বয়স তখন মা মারা যান। আমি একমাত্র মেয়ে। সবাই তখন বাবাকে বললো আরেকটা বিয়ে করার জন্য। কিন্তু বাবা রাজি হলেন না। দ্বিতীয় বিয়ের কারণে আমার হয়তো অযত্ন হতে পারে এই আশঙ্কায় বাবা আর বিয়ে করলেন না। আমি বাবা আর দাদীর যত্নে বেড়ে উঠতে লাগলাম।

বাবার একটা আচরণ আমাকে ভীষণ অবাক করে দেয় এবং খুব ভালো লাগে। আমি যদি কোনো দরকারে বাবার রুমে যাই, বাবা হয়তো তখন বিছানায় শুয়ে কিংবা চেয়ারে বসে আছেন, কিন্তু আমাকে দেখার সাথে সাথে তিনি উঠে দাঁড়ান। এবং এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে আমাকে বসান, এরপর নিজে বসেন। তারপর হাসি মুখে জানতে চান, কেনো এসেছি?

যখন দশম শ্রেণিতে পড়তাম তখন বাবাকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'বাবা, আপনি আমাকে দেখলে দাঁড়িয়ে গিয়ে আমার হাত ধরে প্রথমে আমাকে বসান তারপর নিজে বসেন। আর কোনো বাবাকে তাদের মেয়েদের সাথে এতো সুন্দর আচরণ করতে দেখিনি। এর পেছনে কারণ কী?।'

বাবা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'এই সুন্দর ব্যবহার শিখেছি নবীজীর সুন্নাহ থেকে। নবীজীর মেয়ে ফাতেমা যখন কোনো প্রয়োজনে তাঁর কাছে আসতেন, নবীজী তখন উঠে দাঁড়াতেন। এবং মেয়েকে হাত ধরে বসাতেন, তারপর নিজে বসতেন। তাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবা হলেন নবীজী (সাঃ)। আমি তাঁকে অনুসরণ করেছি মাত্র।'

তারপর বললেন, 'মেয়ে ফাতেমাও বাবাকে অকৃত্রিম ভালোবাসতেন। একটা ঘটনা বললে বুঝতে পারবি। ফাতেমার যখন দশ বছর বয়স, তখন একদিন নবীজী মসজিদে নামাজ পড়ছিলেন। ঐ সময় সেখানে কুরাইশদের একটি দল এসে উপস্থিত হলো। তাদের নেতা ছিলো আবু জাহেল। সে তখন দলের সবাইকে বললো, 'তোমাদের মধ্যে কে মুহাম্মদের গায়ে মৃত পশুর নাড়ীভুঁড়ি ছুঁড়ে ফেলতে পারবে?' উকবাহ ইবনে আবু মুয়াইত নামের একজন তৎক্ষনাৎ ছুটে গেলো এবং নোংরা আবর্জনা এনে সেজদারত নবীজীর (সাঃ) গায়ে ছুঁড়ে মারলো। ছোট্ট ফাতেমা দৃশ্যটি দেখলেন। তিনি তখন বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে দৌড়ে এসে বাবার শরীর থেকে আবর্জনাগুলো ফেলে দিয়ে নবীজীকে (সাঃ) ঘিরে দাঁড়ালেন। যেনো পুনরায় বাবার গায়ে কেউ আবর্জনা ফেলতে না পারে। ছোট্ট ফাতেমার সাহস দেখে কুরাইশরা হতবাক হয়ে গেলো। এবং আর কিছু না বলে সেখান থেকে চলে গেলো। বাবার প্রতি তিনি কী অসাধারণ ভালোবাসা দেখালেন, তাই না?'
মুগ্ধ হয়ে শুনলাম।

তারপর সময়ের প্রবাহে একসময় আমার পড়াশোনা শেষ হলো। চাকরিতে ঢুকলাম। দাদী মারা গেলেন। আর বাবা নানা রকম রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

অসুস্থ শরীরে বাবা আমার জন্য পাত্র দেখতে লাগলেন। এবং ভালো সম্বন্ধ পেয়ে যখন আমাকে বিয়ের কথা বললেন, তখন স্পষ্ট উচ্চারণে বাবাকে বললাম, 'আমি বিয়ে করবো না।'

বাবা আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কেনো?'

উত্তরে বললাম, 'মায়ের মৃত্যুর পর আপনি অনায়াসে বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু আমার অযত্ন হতে পারে ভেবে আপনি আর বিয়ে করলেন না। সেই আপনাকে অসুস্থ এবং একা রেখে আমি কী করে বিয়ে করি?'
বাবা ঝরঝর করে কেঁদে দিলেন।

গ্রামের বাড়িতে আমাদের বেশ কিছু জমিজমা আছে। যেহেতু আমরা গ্রামে থাকতাম না, তাই সেগুলো দেখাশোনার নামে ভোগ করতো আমার চাচা। এসব নিয়ে কথা বললে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ হবে ভেবে বাবা চুপ থাকতেন। কিন্তু যেদিন শুনলেন, চাচা বাবার সম্পত্তি জালিয়াতি করে নিজের নামে করে নিচ্ছে, সেদিন বাবা চাচাকে ঠেকানোর জন্য গ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। অসুস্থ বাবাকে একা গ্রামে যেতে দেয়ার প্রশ্নই আসে না। তাই সঙ্গে গেলাম।

বাড়িতে বাবা এবং চাচার পরিবারের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে উত্তপ্ত বাক বিতণ্ডা হতে লাগলো। এক পর্যায়ে চাচা এবং চাচার ছেলেরা বাবাকে মারার জন্য তেড়ে আসলো। আমি তখন বিদ্যুৎ বেগে বাবার সামনে এসে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় ওদেরকে বললাম, 'আমার বাবার গায়ে যদি হাত তোলা হয়, তাহলে এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। খবরদার!'

এরপর বললাম, 'অনেকদিন থেকে আপনাদের অন্যায় সহ্য করে আসছি। কিন্তু বাবার কারণে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। সেই বাবার সাথে যখন আপনারা বাজে আচরণ করলেন তখন আর আপনাদের ক্ষমা করা হবে না।'

আমার প্রবল রাগ আর অনড় চেহারা দেখে ওরা থমকে গেলো। ওরা জানে আমি শহরে ভালো চাকরি করি। উচ্চপদস্থ অনেকের সাথে আমার পরিচয় আছে। আমি চাইলে ওদের জেলে ঢোকাতে পারি।

তারা তাই পিছিয়ে গেলো। এবং সেই যে পেছালো, তারপর আর কোনোদিন সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা করে নি।
সেদিন রাতে বাবা আমাকে বললেন, 'মাগো, তুই নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মেয়ে।'

জবাবে বললাম, 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মেয়ে হলেন নবীজীর মেয়ে ফাতেমা (রা.)। আমি তাঁকে অনুসরণ করেছি মাত্র।'
বাবা তখন শরীরের চাদর মেঝেতে বিছিয়ে দিয়ে বললেন, 'নবীজী তার মেয়েকে বসার জন্য গায়ের চাদর বিছিয়ে দিতেন। আমি তোর জন্য বিছিয়ে দিলাম।'

আমার প্রতি বাবার এই আশ্চর্য স্নেহ সম্মান দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। এবং চোখ দুটো ভিজে উঠতে লাগলো। আমি প্রথমে বাবার হাত ধরে চাদরের ওপর বাবাকে বসালাম। তারপর নিজে বসলাম। ঠিক যেমন বাবা করেন আমার সাথে।

অতঃপর বাবার চাদরের ওপর বসে চোখের পানি লুকাতে হিমশিম খেতে লাগলাম।

মৃত্যু নদীর সাঁতারু

সঞ্জয় বসাক পার্থ
সহকারী অধ্যাপক
ডিপার্টমেন্ট অব মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম

সময় তখন ১৯৯৮ সাল। মার্টিন ফন ডার ভিজডেনকে ভাবা হচ্ছিলো সাঁতারে ডাচদের ভবিষ্যৎ। ২৫ বছর আগে কথাটাকে অবশ্য একটুও মিথ্যে মনে হচ্ছিলো না। কী দুর্দান্তভাবেই না দৃশ্যপটে আবির্ভাব তার! নেদারল্যান্ডসের জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় ১৫০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল সাঁতারে প্রথমবার অংশ নিয়েই চ্যাম্পিয়ন। এরপর পদক জিতলেন আরও টানা ৩ বছর। মার্টিনের সাথে পাল্লা দিতে পারে, এমন কেউ তখন গোটা নেদারল্যান্ডসে দুর্লভ।

লড়াই করার মতো ‘প্রতিপক্ষ’ অবশ্য দ্রুতই পেয়ে গেলেন মার্টিন। তবে এমন প্রতিপক্ষ কে-ই বা চায়! সোনালী চুলের সুদর্শন মার্টিনকে কিছুদিন পরেই সাধের চুল বিসর্জন দিতে হলো। বলা ভালো, বিসর্জন দিতে বাধ্য হলেন। জল ছেড়ে মার্টিনের আশ্রয় হলো হাসপাতালের বিছানায়। ধীরে ধীরে টের পাচ্ছিলেন, শরীরে আর আগের মতো জোর পাচ্ছেন না। অস্বাভাবিক দুর্বলতা আর সহজে ক্ষত না সারার সমস্যা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন হাসপাতালে।

রক্ত পরীক্ষায় ধরা পড়লো, রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার উপস্থিতি স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটা বেশি। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে লিউকোমিয়া। আর পরিষ্কার বাংলায় বললে, ‘রক্তের ক্যান্সার’।

ক্যারিয়ার শুরুর আগে থেকেই স্বপ্ন ছিল, একদিন অলিম্পিক পদকজয়ীদের তালিকায় নাম লেখাবেন। মার্টিনের সেই স্বপ্ন তখন শূন্যের ঘরে। পদক দূরের কথা, বেঁচে ফিরবেন এটা নিজেই বিশ্বাস করতে পারতেন না। তাও একের পর এক কেমোথেরাপি নিতে থাকলেন, বোন ম্যারোও প্রতিস্থাপন করানো হলো। সকলের এত প্রচেষ্টা বিফলে যায়নি, ক্যান্সার জয় করে ফিরে আসেন মার্টিন।

তবে মার্টিনের রোমাঞ্চকর গল্পের মূল ক্লাইম্যাক্স তখনও বাকি। ক্যান্সার থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এসে মার্টিন যা করেছেন, তা হার মানাতে পারে যেকোনো রূপকথার কাহিনীকেও। ক্যান্সার থেকে সেরে উঠলেন ২০০৪ সালে। ওই বছরেই লেক ইয়েসেল সাঁতরে পার হলেন ৪ ঘণ্টা ২১ মিনিট সময় নিয়ে। আগের রেকর্ডের চেয়ে যা ১৫ মিনিট কম। যারা জানেন না তাদের উদ্দেশ্যে বলা, লেক ইয়েসেল পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে বড় হ্রদ। রেকর্ড গড়ার পুরস্কার হিসেবে যে ৫০ হাজার ইউরো পেয়েছিলেন, তার পুরোটাই দান করে দিয়েছিলেন ক্যান্সার গবেষণায় সাহায্য করার জন্য।

ধীরে ধীরে ফিরলেন প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারেও। ফিরেই ৪০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল চ্যাম্পিয়ন। তবে মার্টিন দূরপাল্লার সাঁতারে বেশি স্বচ্ছন্দ ছিলেন। লক্ষ্যও ছিল দূরপাল্লার সাঁতারে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়া। ক্যান্সার হার মেনেছে যার কাছে, তার কাছে এ আর এমন কি চ্যালেঞ্জ! স্পেনের সেভিয়ায় ২০০৮ সালে বিশ্ব সাঁতার প্রতিযোগিতায় জিতলেন স্বর্ণপদক, সেই সুবাদে প্রথমবারের মতো সুযোগ পেলেন অলিম্পিকে যাওয়ার।

মার্টিনের অবিস্মরণীয় গল্পের শেষ অধ্যায়টা লেখা হলো বেইজিংয়ে। যার বেঁচে থাকা নিয়েই ছিল সংশয়, সেই মার্টিনই ২০০৮ সালের বেইজিং অলিম্পিকে জিতলেন সোনা। ১০ কিলোমিটার সাঁতরে হারালেন ফেভারিট ডেভিড ডেভিসকে। অনবদ্য এই পারফরম্যান্সের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৮ সালেই পান 'ডাচ স্পোর্টসম্যান অব দ্য ইয়ার' খেতাব।

পুরস্কার হাতে নিয়ে সবার প্রথমে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন এমন সব না জানা ব্যক্তিদের, যারা ক্যান্সার গবেষণায় বিনিয়োগ করেছেন মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার। ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন তার চিকিৎসকদেরও, তিনি হাল ছেড়ে দিলেও চিকিৎসকেরাই যে তাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন! আর বলেছিলেন, 'Now it's time to swim against cancer; not for me, but for other people'.

সুখ

জান্নাতুল ফেরদৌস
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব ইকনোমিক্স

খুব সাবধানে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেয়ালের টিকটিকিটার দিকে তাকিয়ে আছে রাতুল। ধবধবে সাদা দেয়ালে টিকটিকিটা এদিক সেদিক করছে, একটু পর পর তার দিকে ঘাড় বাকিয়ে তাকাচ্ছে, একেবারে চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে না। রাতুল তাকিয়ে আছে পলকহীন চোখে। পনের মিনিটের বেশি সময় হয়েছে রাতুল এসেছে। এর মধ্যে একবার শুধু বাসার ছোট্ট মেয়েটা পর্দা সরিয়ে উঁকি দিয়েই দৌড়ে পালিয়েছে। স্টুডেন্টের হাসির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সে যে এতোক্ষণ অপেক্ষা করছে তা ভুলে গেছে নাকি কে জানে। এটা অবশ্য রোজ দিনকার কাহিনী। টিকটিকিটা এই সময় তাকে সঙ্গ দেয় মনে হয়। সে খেয়াল করেছে স্টুডেন্ট সামনে এলে টিকটিকিটার আর দেখা পাওয়া যায় না। এই টিউশনিটা ছেড়ে দেওয়া খুব দরকার হয়ে পড়েছে। ছাড়ার উপায় নেই, ঢাকা শহরে টিউশন আর সোনার ডিম পাড়া হাঁস একই জিনিস। আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সে। তার জীবনটা বোধহয় দীর্ঘশ্বাসে দীর্ঘশ্বাসেই যাবে।

চিন্তায় ছেদ ঘটলো যখন স্টুডেন্ট বইখাতা নিয়ে হাজির হলো। ধপ করে বইগুলো সামনে রেখেই বললো, "ভাইয়া আমি কিন্তু সামনের সপ্তাহ পড়তে পারবো না।"

মনে মনে রাতুল একবার বেয়াদব বলে নিলো বাচ্চাটাকে। মুখে শুধু বললো,
--কেন?
--আমরা সবাই থাইল্যান্ড ঘুরতে যাচ্ছি, ফ্যামিলি ট্রিপ।
উত্তরে রাতুল মুখে বললো, "আচ্ছা।" মনে মনে বলল, "জীবন যেখানে যেমন।"

টিউশন শেষ করে রাস্তায় হাটতে হাটতে ভাবছে, এই দুনিয়াতে প্রিভিলেজড মানুষগুলো কতো সুখী। তাদের কোন চিন্তা করতে হয় না। সুখের জন্য কতো কিছুই করতে পারে তারা। ঘুরাফেরার শখ তো তারও ছিল, তবে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সেজো ছেলে হওয়ায় সেইসব কখনোই পূর্ণতা পায় নাই। সমুদ্র তার ভীষণ প্রিয়। মন খারাপ হলেই তার সমুদ্রের কাছে চলে যেতে ইচ্ছে হয়। অদ্ভুত হলেও সত্যি জীবনে এখন পর্যন্ত একবারও সমুদ্র দেখার সৌভাগ্য হয়ে উঠেনি। ফেসবুকে রিলস দেখেই সমুদ্র দেখার তৃষ্ণা পূরণ করেছে সে আজ পর্যন্ত। ভেবেছিল এইবার ব্যাচট্রিপে সেই ইচ্ছে পূরণ হবে। তবে ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস সে যেতে পারছে না। অনার্স চতুর্থ বর্ষের ছাত্র রাতুল। ফাইনাল ইয়ারে এসে তাদের একটি ব্যাচট্রিপ হয়। নানা ঝামেলায় এবার ব্যাচট্রিপ হবে কি হবে না তা নিয়ে অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব গিয়েছে গত দুইটি মাস। ব্যাচট্রিপ যেন হয় তা নিয়ে সবচাইতে বেশি লাফালাফি করা মানুষগুলোর মধ্যে রাতুল সবচেয়ে এগিয়ে থাকবে। শুরু থেকে প্রত্যেকটা আয়োজনে সে কাজ করেছে। জীবনে প্রথম সমুদ্র দেখা বলে হয়তো তার আগ্রহই সবচেয়ে বেশি ছিল। পাঁচটা দিনের একটি ট্রিপের জন্য কত শত প্ল্যানিং তাদের। রাতুল ছিল সব আয়োজনের মধ্যমনি এবং মূলহোতা। নিম্ন মধ্যবিত্ত একটা পরিবারে এসব শখের জন্য আলাদা করে টাকা চাওয়া যায় না। তাই টিউশনের টাকা একটু একটু করে অনেকদিন ধরে জমিয়ে রেখেছে রাতুল। আর তিন দিন পর ব্যাচ ট্রিপ। যাওয়া হচ্ছে না রাতুলের। গত সপ্তাহে মায়ের ডেঙ্গু ধরা পড়ে। যখন ধরা পড়ে তখনই মায়ের অবস্থা বেশ খারাপ ছিল। তাড়াতাড়ি হসপিটালে

ভর্তি করতে হয়। সেখানে অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে গেছে তার পরিবারের। এমন অবস্থায় স্বার্থপরের মত টাকাগুলো নিজের কাছে ধরে রাখতে মন সায় দেয়নি তার। বাবার হাত তুলে দিয়েছিল জমানো টাকাগুলো। মা এখন অনেকটাই সুস্থ।

শেষের দিকে সকল আয়োজন থেকেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে সে। এই নিয়ে কয়েকদিন বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলেও এখন আর কেউ অতটা ঘাটায়না। যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। একজন গেল কি গেল না তাতে কি যায় আসে!

মোবাইলের রিংটোন এর শব্দে ফোনটা হাতে নিল রাতুল। বন্ধু শফিক কল করেছে। কলটা ধরতে ইচ্ছে করছে না তার। ইদানিং কেন যেন কারো সাথে কথা বলতে ভালো লাগে না। চাপা এক ধরনের অভিমান কাজ করে, অথচ তাদের তো কোন দোষ নেই। প্রিভিলেজড হওয়াটা তো দোষের মধ্যে পড়ে না! মোবাইলটা আবার পকেটে রেখে দিলো রাতুল। বাজছে, বাজুক। এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে টং এ বসে আছে সে। ফোনটা আবার বাজছে। কানে নিয়েই বিরক্ত হয়ে রাতুল বলল,

-হ্যাঁ, বল।
-কিরে কই তুই?
-আছি কেন বল?
-কই আছিস সেটা তো বল, দরকার আছে।
-বাসার কাছের টং এ, চা খাচ্ছি।
-ওইখানে থাক, আমি আসছি।
-আমার একটু কাজ আছে, বাসায় যেতে হবে।
-কিছুক্ষণ থাক বেশিক্ষণ লাগবে না আসছি।

বিরক্তি নিয়ে কলটা কেটে ফোনের স্ক্রিনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে। মনে মনে নিজেকে কিছুক্ষণ বকাবকি করল, কেন কলটা রিসিভ করতে গেল। শুধু শুধু এখন কথা বলা লাগবে। কারো সাথে কথা বলতে ভালো লাগছে না তার। কিছুক্ষণ পর শফিক দৌড়াতে দৌড়াতে এল। কিরে তোর তো খোঁজই পাওয়া যায় না, কই থাকিস? ক্যাম্পাসে যাস না, তোকে খুঁজতে খুঁজতে হয়রান।
-খুঁজতেছিলি কেন?
-এটা নে আগে।
-কি এটা?
একটা খাম হাতে নিতে নিতে প্রশ্ন করে রাতুল। খামটা খুলে দেখল বেশ কিছু টাকা।
-টাকা কেন? কিসের টাকা এটা?
-তোর ব্যাচট্রিপের টাকা জমা দেওয়া হয়েছে, সকাল ছয়টায় ক্যাম্পাসে থাকিস শুক্রবার।
-মানে কি এসব?
-এই গুলো দিয়ে বাকি যা যা দরকার কেনাকাটা করে ফেল আজকালকের মধ্যেই? নাকি এখনি যাবি? আমারও কিছু কেনাকাটা বাকি।
হতবিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছে রাতুল শফিকের দিকে। কী বলে ও এইসব!
--কিরে ব্যাটা, কিসে?
--আমি কিছু বুঝতেছিনা।

-তুই ভাবলি কিভাবে তোকে ছাড়া ব্যাচট্রিপ হবে? -আমাদের কে দেখে কি গাধা মনে হয়? আমরা বুঝি না কিছুই? তোকে ছাড়া গেলে কোনো মজাই হবে না। আমাদের সাথে চল।
-কিন্তু এতোগুলা টাকা তুই কেমনে দিচ্ছিস? আমি এইটা কেমনে নিবো? তুই পাগল? এইবার তোরা ঘুরে আয়, পরে কোনোদিন আবার যাবো একসাথে।

- আরে গাধা এই টাকা তো আমি দেই নাই। আমরা সবাই মিলে দিলাম। চিন্তা করতে পারোস? চার বছরে যেই ব্যাচের পোলাপাইন এর ইউনিটি দেখলাম না সেই ব্যাচের পোলাপাইন এই এক ব্যাপারে সব একমত, কেউ তোরে ছাড়া যাইতে রাজি না।

রাতুল তাকিয়ে আছে শফিকের দিকে, হঠাৎ করেই তার চোখে পানি ছলছল করছে, খুব সাবধানে সেটা আড়াল করলো সে। আগে সমুদ্র দেখার টানে এই ট্রিপে যেতে চাচ্ছিলো সে, এখন মনে হচ্ছে এই মানুষগুলোর সাথে যেখানে যেতে বলা হবে সেখানে যেতেই রাজি সে।

ঠান্ডা ঢেউ এসে একটু পর পর রাতুলের পা ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, পায়ের তলার বালু সড়ে প্রত্যেকবার গা সিড়সিড় করে উঠে রাতুলের। একরাশ ভালোলাগা আর সুখ সুখ অনুভূতি নিয়ে অবাক চোখে সুর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে আছে সে। মনের কোথাও ছোট্ট একটা প্রশ্ন বারবার উঁকি দেয়, বছরে দুই একবার বিদেশ বিভূইয়ে ঘুরে আসা বাচ্চাটাও কি একই সুখ নিয়ে থাইল্যান্ড দেখছে এখন?

দরিদ্রতা

মোঃ তৌফিকুল ইসলাম
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব সোশিওলজি

এক ছুটির দিনে বাজার করে বাসায় ফিরছিলাম। অন্যান্য বাজারের সাথে দু'কেজি ছাগলের মাংসও কিনেছিলাম। রিকশা যখন এপার্টমেন্টের সামনে এসে থামলো, তখন এক পরিচিত মানুষের সাথে দেখা হয়ে গেলো। বাজার সদাই রিকশা থেকে নামিয়ে রেখে মানুষটির সাথে বেশ কিছুক্ষণ কথা বললাম। তারপর কথা শেষে বাসায় ঢুকে বাজারগুলো রান্নাঘরে রাখলাম। মা ঘরের অন্য কাজ সেরে আধা ঘণ্টা পর রান্নাঘরে ঢুকলো। সে বাজার দেখে আমার উদ্দেশ্যে বললো, "মাংস আনো নি?" বললাম, "এনেছি। দু'কেজি ছাগলের মাংস এনেছি।" "নেই তো।" রান্নাঘরে গিয়ে দেখলাম মাংস সত্যি নেই। মাকে বললাম, "গেটে পরিচিত এক মানুষের সাথে কথা বলার সময় বাজার সদাই নিচে রেখেছিলাম। কথা শেষে বাসায় আসার সময় সম্ভবত মাংসের ব্যাগ ওখানে ফেলে এসেছি।" এই বলে ছুটে গেলাম গেটের দিকে। সেখানে মাংসের ব্যাগ পেলাম না। গেটে দারোয়ানও নেই। বাসায় এসে মাকে বললাম, "আমি নিশ্চিত মাংস দারোয়ান চুরি করেছে।" "না জেনে দোষ দেয়া ঠিক না।" জোর গলায় বললাম, "আমি নিশ্চিত সে চুরি করেছে। ওখানে সে ছাড়া অন্য কেউ ছিলো না। মাংসের লোভ সে সামলাতে পারে নি। আর তাছাড়া গরীবদের চুরির অভ্যেস থাকে।" এই সময় কলিং বেল বেজে উঠলো। দরোজা খুলে দেখলাম, দারোয়ান মাংসের ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাকে বললো, "স্যার, মাংসের ব্যাগটি কি আপনাদের? ব্যাগটা গেটে পড়েছিলো। ভাবলাম এপার্টমেন্টের কেউ হয়তো ভুলে ফেলে গেছে। পুরো এপার্টমেন্টের সব ফ্লাটে গিয়ে জিজ্ঞেস করছিলাম, কেউ গেটে মাংসের ব্যাগ ফেলে গিয়েছিলো কিনা?" বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর বললাম, "হ্যাঁ, ওটা আমাদের।" সে হেসে ব্যাগটা রেখে চলে গেলো। দুদিন পরের ঘটনা। বাবা এক সন্ধ্যায় আতঙ্ক নিয়ে বললেন, তার মানিব্যাগটা পাচ্ছেন না। বিকেলের দিকে কাজের মহিলাটা এসেছিলো। মাকে বললাম, "আমি নিশ্চিত কাজের মহিলাটা মানিব্যাগ চুরি করেছে। কাল কাজে এলে ওকে শক্ত করে ধরবে।" "তুমি আবারো না জেনে অন্যকে দোষ দিচ্ছো।" "তোমাকে যা বললাম তাই করবে। গরীব মানুষদের চুরির অভ্যেস থাকে। আমি অনেক দেখেছি।" এর ঘন্টা খানিক পরই বাবা বললেন, তিনি মানিব্যাগটা খুঁজে পেয়েছেন। খাটের কোনায় নাকি পড়েছিলো। মা তখন বললো, "দারোয়ান আর বুয়ার কাছে তোমার সরি বলা উচিত। কারণ বিনা অপরাধে তুমি তাদের দোষারোপ করেছো। আর আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, গরীবদের সম্বন্ধে তোমার যে একটা ভুল ধারণা আছে তা ত্যাগ করো। কেননা, গরীব হলেই মানুষ চোর হয় না। প্রমাণ তো একাধিকবার পেয়েছো।" মায়ের কথা মেনে নিলাম। এবং উপলব্ধি করলাম, আর্থিকভাবে দরিদ্র মানুষগুলো খারাপ হয় না, খারাপ হয় মনের দিক থেকে দরিদ্র মানুষগুলো। যেমন আমি। পরদিন দারোয়ান আর বুয়াকে সরি বললাম। তারপর থেকে মনের দরিদ্রতা ঘুচতে শুরু করলো। আর এজন্য চিরকৃতজ্ঞ আমার মায়ের কাছে, মনের দিক থেকে যিনি ধনী।

গন্তব্য-বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

ইমতিয়াজ আহমেদ
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স

২০২১ সাল। ইমন এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেছে। পরীক্ষা পাশ করে সে যেন বিপদেই পড়ে গিয়েছে। সে ভেবেছিল পরীক্ষা শেষ করে সে দীর্ঘদিন ছুটি কাঁটাবে, কিন্তু তা আর হলো কোথায়। পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই শুরু হলো ছোটাছুটি, কখনো কোচিং থেকে প্রাইভেট, কখনোবা প্রাইভেট থেকে কোচিং। কারণ তো একটাই, তাকে লাখো পরীক্ষার্থীদের পিছনে ফেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ করে নিতে হবে। শুরু হয়ে গেল পড়াশোনার মহাব্যস্ততা।

সবকিছু ঠিকই চলছিলো, তবে হঠাৎ একদিন ইমন অসুস্থ হয়ে পড়লো। সমস্ত শরীর ব্যথা, সাথে তীব্র জ্বর। ডাক্তারের শরনাপন্ন হলে, পরীক্ষা শেষে নিশ্চিত হলো, সে "কোভিড-১৯" আক্রান্ত। বেশ কিছুদিন পার হলো, ইমন সুস্থ হয়ে ফিরলো। তবে ততোদিন তার পড়ালেখার বিরতি থাকায়, সে পড়ালেখা ও কোচিং ক্লাস থেকে অনেক পিছিয়ে গেলো। তখন তারই বন্ধু 'তাজিম' তাকে বললো, দেশের একমাত্র সামরিক বাহিনী দ্বারা পরিচালিত স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস', স্নাতক পর্যায়ে ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ইমন সেবারই প্রথম এই স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শুনতে পায়। পরবর্তীতে ইন্টারনেটে ঘাটাঘাটি করে নানা তথ্য এবং ছবি দেখে সে ধারণা পায় এবং ইমনের প্রবল ইচ্ছে হয়, সে 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস' প্রতিষ্ঠান থেকেই তার স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা সম্পন্ন করবে। কিন্তু কিভাবে সম্ভব, তার তো এখনো পুরোপুরি প্রস্তুতি নেয়া হয়নি অথচ কিছুদিন পরই পরীক্ষা। সে হতাশ হলো, তবে মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলো, আগামীবছর সে অবশ্যই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।

একবছর পর পুনরায় 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস' হতে স্নাতক পর্যায়ে ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এবার যথাসাধ্য প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ইমন। লিখিত পরীক্ষা আশাতীত হওয়ায়, মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিলো ইমন। কিছুদিন পর লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়, মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের নামের তালিকায় ইমনের নামও রয়েছে। ফলে মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের মনোবল আরো বৃদ্ধি পায়। মৌখিক পরীক্ষা শেষে, এসে গেলো সেই কাঙ্ক্ষিত দিন। চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে চূড়ান্ত তালিকায় নিজের নাম না দেখে অপেক্ষমান তালিকায় নাম দেখতে পেয়ে কিছুটা হতাশই হতে হয়েছিল ইমনকে। কিছুদিন অপেক্ষা করার পর ইমন একদিন আশাই ছেড়ে দিলো।

কিছুদিন পার হয়ে গেলো, হঠাৎ একদিন 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস' কর্তৃপক্ষ থেকে ফোন-কল পেলো ইমন এবং তাকে বলা হলো, সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য মনোনীত হয়েছে। বিষয়টি ইমনের নিকট কিঞ্চিত স্বপ্নের মতো মনে হলো এবং তার খুশির বাঁধ ভেঙ্গে গেলো। আনন্দে তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো এবং সৃষ্টিকর্তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালো। সে মনে-মনে নিজেকে বললো, মানুষের স্বপ্নপূরণের অগ্রযাত্রায় কখনো আশা হারাতে নেই।

আমার শখ: চিঠি লেখা ও পোস্টকার্ড সংগ্রহ

জাহরা আনজুম
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস

২০২০ সালে আমার এসএসসি পরীক্ষা শেষ হবার কিছুদিন পরই করোনা মহামারীর কারণে লকডাউন শুরু হয়। সময়টাকে কাজে লাগাতে আমি তখন অনলাইনে ফ্রেঞ্চ ভাষা শেখা শুরু করি। অনলাইনের সে কোর্সে তখন নানা দেশের অনেক শিক্ষার্থীর সাথে পরিচয় হয়। অল্প সময়েই কয়েকজনের সাথে বেশ ভালো বন্ধুত্ব হয় আমার।

একদিন সেই কোর্সের টিচার, মাদাম ওদ, আমাদের পেনপালিং (পেনফ্রেন্ডদের চিঠি লেখা) আর পোস্টকার্ড সংগ্রহের শখ সম্পর্কে বললেন। তিনি বলেন, এই শখের মাধ্যমে যেমন নিজেদের সংস্কৃতি অন্যদের কাছে তুলে ধরা যাবে, তেমনি ফ্রেঞ্চ ভাষাও চর্চা করা যাবে। বুদ্ধিটা সবারই খুব ভালো লেগেছিলো। অনেক দেশেই পরিবার ও বন্ধুদের কাছে চিঠি ও পোস্টকার্ড পাঠানোর চল এখনো রয়েছে। বিশেষত, আমেরিকা, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, ইতালি, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন, প্রভৃতি দেশে।

মাদামের বুদ্ধিটা নিঃসন্দেহে চমৎকার ছিলো, তবে কোথা থেকে শুরু করবো তা তখন বুঝতে পারছিলাম না। সৌভাগ্যক্রমে, বাবা-মায়ের বিদেশে চিঠি পাঠানোর অভিজ্ঞতা ছিলো। তাদের অনুপ্রেরণা, সাহায্য, ও দিকনির্দেশনায় আমি ইতালি, স্লোভেনিয়া ও আমেরিকায় আমার কয়েকজন বন্ধুকে পোস্টকার্ড পাঠাই।

২০২০ সালের ২০শে নভেম্বর আমাকে ইতালির বন্ধু পাওলা-র পাঠানো দুটি পোস্টকার্ড দিয়ে যান আমাদের এলাকার পোস্টম্যান আংকেল। কার্ড দুটো হাতে পাবার পর খুব খুশি হয়েছিলাম সেদিন। পাওলা কার্ড দুটো অক্টোবর মাসের শুরুতে পাঠিয়েছিলো। তারপর থেকেই আমি অধীর আগ্রহে তার কার্ডের অপেক্ষায় ছিলাম। বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ইন্টারনেট আবিষ্কারের আগে মানুষ কতটা আগ্রহ নিয়ে প্রিয়জনের চিঠির জন্য অপেক্ষা করতো, তা আমি কিছুটা হলেও তখন উপলব্ধি করেছিলাম।

২০২১ সালের ১৩ই জানুয়ারি আমি আমার জীবনের প্রথম চিঠি পাঠাই আমেরিকার জর্জিয়ায় বসবাসকারী বন্ধু নাতাশা-কে। সারাজীবন পরীক্ষার খাতায় কত চিঠি লিখেছি, একটারও উত্তর আশা করিনি। সেবারই প্রথম উত্তর পাবার আশা নিয়ে চিঠিটি পাঠাই। ৬ই এপ্রিল আমি নাতাশার উত্তর পাই, সেটি এক অসাধারণ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা ছিলো আমার জন্য। মহামারীর সেই অবরুদ্ধ সময়ে আমি যেন পোস্টকার্ড আর চিঠির মাধ্যমে বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছি।

২০২১ সালের কয়েকমাস, কোভিড-১৯ মহামারীর জন্য আন্তর্জাতিক বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক দেশে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকায়, সেসময় ব্যতীত আমি নিয়মিত চিঠি আদান-প্রদান ও পোস্টকার্ড সংগ্রহ করতে থাকি।

বর্তমানে আমার ১৫ টি দেশের ১৮ জন পেনফ্রেন্ড রয়েছে, যাদের সাথে নিয়মিত চিঠি আদান-প্রদান হয়। সময়ের পরিক্রমায়, সারা বিশ্বের আরও অনেক মানুষের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে, যাদের এই শখ রয়েছে।

২০২১ সাল থেকে চিঠি লেখা আর পোস্টকার্ড সংগ্রহের পাশাপাশি আমি নানা দেশের কয়েন, ব্যাংক নোট, ডাকটিকেট ও টিব্যাগ সংগ্রহ শুরু করি।

আমার সংগ্রহে এখন ১৩০টি দেশের ৬০০-এর অধিক পোস্টকার্ড, ১০৩টি দেশের প্রায় ১২০০ ডাকটিকেট, এবং ৩৩টি দেশের কয়েন ও ব্যাংক নোট রয়েছে। এখন পর্যন্ত আমি ৬৭টি দেশের ১৩৬টি ভিন্ন ব্লেন্ডের চায়ের স্বাদ নিয়েছি।

চিঠি লেখা আর পোস্টকার্ড সংগ্রহের শখ আমার জীবনকে অনেকখানি বদলে দিয়েছে। আমি যেমন ভূগোল, নানা দেশের বৈচিত্র্যময় জীবনধারা, মতাদর্শ, বিশ্বাস, ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি, তেমনি আমার ভাষাগত দক্ষতা ও যেকোনো মানুষের সাথে মেশার দক্ষতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই শখ আমাকে বিশ্বের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে নানা মতের মানুষের প্রতি সহনশীল হতে শিখিয়েছে। সর্বোপরি, আমার সকল বিদেশি বন্ধুর কাছ থেকে আমি যে পরিমাণ ভালোবাসা পেয়েছি, তা তুলনাহীন।

দুঃখের বিষয় হলো, বাংলাদেশে চিঠি লেখা ও পোস্টকার্ড সংগ্রহের চল অন্যান্য দেশের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম। বাইরের অনেক দেশে পুরনো এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে নানারকম উদ্যোগ নেওয়া হয়, যা আমাদের দেশে অনুপস্থিত। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মানুষও এই সুন্দর চর্চা শুরু করবে।

বাংলাদেশের অনেক পোস্ট অফিসের দেয়ালে একটি বাক্য লেখা থাকে, যা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। তা হলো-"চিঠি লিখুন, ইহা স্থায়ী"। কথাটা খুব সুন্দর, তাই না?

একটি সুযোগ: আমার ভারত ভ্রমণ

এস এম নাহিদ সারোয়ার সুমন
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব ল

২৬শে মার্চ, ২০২২ অন্য সব ফেসবুক পোস্টের মত একটা পোস্ট চোখে পড়লো আমাদের ডিপার্টমেন্ট গ্রুপে। পোস্টটি ছিল ভারতের লয়েড ল কলেজের সামার স্কুলে আবেদন বিষয়ক। সেভাবে গুরুত্ব দিলাম না। কারণ আগে কখনো এমন কিছুতে অংশ নেয়ার অভিজ্ঞতা ছিল না। আবার সুযোগ পাবো এ নিশ্চয়তাও নেই। তাই বিষয়টা নিয়ে বেশি একটা ঘাটলাম না, আবেদনের শেষ সময়েরও তেমন একটা খেয়াল ছিল না।

২১শে এপ্রিল ক্লাস শেষে বন্ধু লাবিবকে দেখলাম হাতে কিছু কাগজ নিয়ে ডিপার্টমেন্ট অফিস থেকে বের হচ্ছে। তার হাত থেকে কাগজগুলো নিয়ে দেখলাম আমাদের আগের সেমিস্টারের নম্বরপত্র। আমি কৌতূহলবসত জানতে চাইলাম সে কেন এটা তুলেছে। সে প্রথমে মজা করে বলল বলা যাবে না। তবে আমার জোরাজুরিতে বললো সে সামার স্কুলের জন্য আবেদন করতে চায় আর আজ রাত বারোটা আবেদনের শেষ সময়। অগত্যা আমি ঠিক করলাম আমিও আবেদন করব। তাই আমিও নম্বরপত্র তুলে ফেললাম। তবে সেদিন আমার কপাল খারাপ ছিল, কারণ আবেদন পত্রটিতে বেশ কিছু তথ্য ও সাথে প্রমাণপত্র দাখিল করতে হতো, তাই একটা লম্বা প্রক্রিয়া ছিল। সেদিন রাতে আমাদের ফ্ল্যাটে আড্ডার আয়োজন বসায় আর আবেদন করা সম্ভব হয় না আমার। পরবর্তীতে জানতে পারি লাবিব এবং রিদয় দুজনেই আবেদন করেছে। আমি ভাবলাম এমনিতেও হতো না, তাই আবেদন করিনি বলে তেমন একটা খারাপ লাগেনি।

এর কয়দিন পরই ঈদুল ফিতরের ছুটি দিয়ে দেয় আমাদের এবং আমরা বাড়ি চলে যাই। ঈদের ঠিক আগের দিন লাবিবের পোস্ট চোখে পড়ে, সে স্কুলটিতে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে এবং সম্পূর্ণ স্কলারশিপসহ! এর কিছুক্ষণ পর রিদয়ের একই পোস্ট। মনটা আফসোসে ভরে উঠল, ইস! যদি আবেদনটা করতাম তাহলে ওদের সাথে আমিও যাওয়ার সুযোগ পেতাম। এসব ভেবে আমি মনে মনে আল্লাহর কাছে অনেক করে চাইলাম আমিও যেন সুযোগটা পাই। তাই ওদের পরামর্শে লয়েড ল কলেজে মেইল করি এবং সাড়া পাই, তবে তারা একটা শর্ত জুড়ে দেয়, তারা কোনো স্কলারশিপ দিতে পারবে না। কিন্তু স্কলারশিপ ছাড়া তো আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব না, তাই মেইল চালাচালি করে ৯ মে নাগাদ স্কলারশিপের ব্যাপারে তাদের রাজি করাতে পারি এবং সেদিনেই তারা আমার মেইলে আমন্ত্রণ পত্র পাঠায়। তারপর আমি দ্রুত অন্যান্য সব কাজ শেষ করে ১৫ মে-তে চূড়ান্তভাবে ভারতীয় ভিসার জন্য আবেদন করি এবং মাত্র তিন দিনে আমার কনফারেন্স ভিসাটি পেয়ে যাই। কিন্তু কিছু জটিলতার কারণে আমার আগে আবেদন করেও বন্ধু লাবিব ভিসা পাচ্ছে না আর রিদয় তার পাসপোর্ট করা নিয়ে দৌড়ের ওপর আছে। উপায়ান্তর না দেখে ২২ মে আমি কলকাতার বাসের টিকিট কেটে ফেলি।

২৩ মে রাতে কলকাতার উদ্দেশ্যে আমার সফর শুরু হলো। যশোরের বেনাপোল বর্ডারে পৌঁছলাম সকালেই, এখানে ইমিগ্রেশনের যাবতীয় কাজ শেষ করতে প্রায় ঘন্টা দুয়েক লেগে যায়। ইমিগ্রেশনের কার্যকলাপ শেষ করে চূড়ান্তভাবে ভারতের হরিদাসপুরে পা দেই। এখান থেকে বাস ধরে কলকাতা মার্কুইস স্ট্রিটে পৌঁছাতে প্রায় আরো চার ঘন্টা সময় লেগে যায়, এরপর শুরু হয় আমার কলকাতা ভ্রমণ। আসলে আমি ইচ্ছে করেই হাতে দুদিন রেখেছিলাম কলকাতা ঘুরে দেখার জন্য।

তো এ দুদিনে কলকাতায় ঘুরে দেখলাম-ব্রিটিশ রানী ভিক্টোরিয়া স্মরণে নির্মিত 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল', কলকাতার বইপাড়া হিসেবে খ্যাত 'কলেজ স্ট্রিট', মান্না দে'র গানের সেই বিখ্যাত 'কফি হাউজ', হোম অব ক্রিকেট খ্যাত 'ইডেন গার্ডেন'' সহ আরো কিছু স্থান।

কলকাতার ফেয়ারলি প্লেস থেকে বিদেশিদের জন্য বরাদ্দ টিকিট দিয়ে ২৬ মে বিকেলে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা করি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রেল জংশন 'শিয়ালদা স্টেশন' থেকে। টিকিটে ট্রেন ছাড়ার সময় ছিল বিকেল ৪:৫০, এবং ট্রেনটি ঠিক সে সময়েই ছাড়লো! তাছাড়া তাদের রেল সেবাও বেশ ভাল ছিল। প্রায় সতের ঘণ্টার জার্নি শেষে পরদিন সকাল এগারোটা নাগাদ ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি পৌঁছালাম।

নয়াদিল্লি পৌঁছে সিএনজি নিয়ে কোনো রকমে লয়েড কলেজে গিয়ে পৌঁছলাম। এবার নয়াদিল্লির এই "গ্রেটার নয়ডা"-র কথা বলি। ল কলেজটি 'নলেজ পার্ক টু' তে অবস্থিত। এখানে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং হোস্টেল দিয়ে ভর্তি। জায়গাটি বেশ ফাঁকাও বটে। পরে ভারতীয়দের কাছে জানতে পেরেছিলাম এটি আগে নয়াদিল্লির অংশ ছিলো না। পরবর্তীতে রাজধানীকে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে গ্রেটার নয়ডা নামক এ জায়গাটির উদ্ভব।

তো পৌঁছতে বেশ খানিকটা দেরী হয়। এদিকে সামার স্কুলের কার্যক্রম সকাল থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিলো। আমি ওরিয়েন্টেশন পর্বটি মিস করে যাই। তবে দুপুরের খাবার সেরে প্রথম সেশনটিতে যখন ঢুকি তখন দেখি বাংলাদেশি এক ব্যক্তি ক্লাশ নিচ্ছেন। তাকে টিভিতে বেশ কয়েকবার দেখেছি বলে মনে হলো। পরবর্তীতে ক্লাশ শেষে তার পরিচয় দেওয়ার পর জানতে পারি তিনি বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান স্যার।

এখন আসা যাক "CLEA-MILAT Human Rights & Social Justice Summer School-2022" সম্পর্কে কিছু কথা নিয়ে। এটি ছিলো মূলত ২৭ মে থেকে ৬ জুন পর্যন্ত এগারো দিনের সামার স্কুল, যার প্রতিপাদ্য ছিলো-''Freedom of Expression"। এছাড়াও ৭ জুন ছিলো পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি সম্রাট শাজাহানের অমর নিদর্শন 'তাজমহল' ভ্রমণ। স্কুলটিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ছাড়াও বাংলাদেশ, নেপাল, কম্বোডিয়া, জিম্বাবুয়ে, যুক্তরাজ্যের মোট আটচল্লিশ জন অংশগ্রহণকারী ছিলাম আমরা। প্রত্যেকদিন ভোর ০৬ঃ৩০টায় যোগ ব্যায়াম দিয়ে শুরু আর রাত ১০টা নাগাদ সব সেশন শেষে ফিরতাম হোস্টেলে। ভারত, বাংলাদেশ ও বেশ কয়টি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আইনজীবী, বিচারপতি, আইএস কর্মকর্তা, সফল উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সেশন নিয়ে সাজানো ছিলো এ কয়দিন।

তাছাড়াও ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট, ইন্ডিয়ান ওয়ার মেমোরিয়াল (ইন্ডিয়া গেট), ইন্ডিয়ান ল ইন্সটিটিউট (আইএলআই)-এর লাইব্রেরি ভিজিট ছিলো অনেক কিছু জানার এবং দেখার এক সুবর্ণ সুযোগ।

আমাদের কর্মপরিকল্পনার অষ্টম দিনে ছিলো "Unity in diversity" অংশ, যেখানে আমরা স্ব স্ব দেশের সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরেছিলাম। আমি সে অনুষ্ঠানে লুঙ্গি ও ফতুয়া পরে বাংলাদেশী ভাইদের সাথে বাংলা গান গেয়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম।

নবম দিন ছিলো আমাদের কমিউনিটি ভিজিট, যেখানে ভারতের উত্তর প্রদেশের একটি গ্রাম "হাসানপুর যাগির"-এ নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানকার মানুষদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। এ গ্রামটিতে ভারতের জাতপ্রথার প্রমাণ পাই। যেখানে উঁচু জাতের বাস নিচু জাতের চলাচলের সেখানে সুযোগ নেই বললেই চলে, যা বেশ খারাপ লেগেছিল আমার। তবে গ্রামের মানুষেরা খুব সহজেই আমাদের সাথে মিশে গিয়েছিলো এবং তাদের আতিথেয়তাও ছিলো মনে রাখার মতো।

এগারোটি দিন ছিলো বেশ চাপের, শ্বাস ফেলবার জো ছিল না। এই মক ট্রায়াল, মুট কোর্ট, প্রেজেন্টেশন আবার দিল্লির প্রচণ্ড তাপ, সব মিলে যেন প্রেসার কুকারের মতো অবস্থা।

তবে সবচেয়ে বেশি উত্তেজনায় ছিলাম যে দিনটি নিয়ে- তাজমহল দেখার দিন! ৭ তারিখ খুব সকালে রওনা করলাম আমরা, প্রায় তিন ঘন্টার জার্নি শেষে পৌঁছলাম আগ্রার তাজমহলে। টিকিট কেটে ভিতরে প্রবেশ করে যতই আগাই ততই মনে হয় ইতিহাসের

সেই মুঘল আমলে চলে এসেছি! তাজমহলের ফোয়ারার সামনের বিশাল গেট থেকে তাজমহলের যে সৌন্দর্য দেখেছিলাম তা কোনোদিন ভোলার নয়। আশপাশ ঘুরে তাজমহলের মূল অংশে প্রবেশ করলাম যেখানে শাজাহান ও মমতাজের কবর। তবে একটা বিষয় অবাক হয়ে খেয়াল করলাম, মহলটির বাইরের অংশে এতটাই গরম যে টেকা মুশকিল, তবে মহলের ভেতরে কোনো ফ্যান বা এসি ছাড়াই বেশ ঠান্ডা এবং আরামদায়ক একটা পরিবেশ, যা তখনকার সময়ের মানুষের নির্মাণশৈলির বিষয়ে ইতিবাচক একটা বার্তা দেয়।

তাজমহল দেখে যতটা ভালো লেগেছিলো, কিছুক্ষণ পর ঠিক ততটাই খারাপ লাগা শুরু করলো। কারণ এটাই ছিলো সবার সাথে কাটানো আমাদের শেষদিন। যদিও আমরা কিছুদিন আগেও কেউ কাউকে চিনতাম না, তবে এই বারোটি দিন একসাথে থাকতে থাকতে একরকম মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম একে অপরের। তবে কি আর করা, বিদায় সে তো অনিবার্য। হয়ত আবার দেখা হবে এ প্রত্যাশায় সবাইকে হাসিমুখেই বিদায় জানিয়েছিলাম সেদিন। এভাবেই শেষ হয়েছিলো আমার স্বপ্নময় কয়েকটি দিন।

মনের বিষাক্ততা দূরীকরণে প্রমোদভ্রমণের গুরুত্ব

মোঃ শরীফুল হাসান খান
সহকারী পরিচালক
কাউন্সিল সেকশন (রেজিস্ট্রার অফিস)

একজন স্বাভাবিক কর্মক্ষম মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য শারীরিক সুস্থতার যেমন গুরুত্ব রয়েছে ঠিক তেমনি মানসিক স্বাস্থ্যেরও গুরুত্ব রয়েছে। আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ব্যস্ততা এবং জীবনের পরিধিতে ভুলে যাই মনের বিষাদ দূরীকরণের আবশ্যকতা। শরীর যেমন বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিষাক্ত হয়ে যায় তেমনি ব্যক্তি জীবনে নানাবিধ সমস্যা, মানসিক চাপ, ক্রোধ, উদ্বেগ, নেতিবাচক ভাবনা, সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তি ইত্যাদি একজন মানুষকে মানসিক অবস্থাকে বিষাক্ত করে তুলতে পারে। শরীরের বিষাক্ততা হয়তো চিকিৎসা শাস্ত্রের মাধ্যমে সারিয়ে তোলা সম্ভব কিন্তু মনের বিষাক্ততা চিকিৎসা শাস্ত্রের মাধ্যমে সারিয়ে তোলা তেমনভাবে সম্ভব হয় না। মনের বিষাক্ততা বা বিষাদ দূর করা সম্ভব ধর্মীয় চর্চা, পরিবার/বন্ধুবান্ধবের সাথে উৎকর্ষ সময় কাটানো, শরীরচর্চা, মেডিটেশন, কাউন্সেলিং, খেলাধুলা, বই পড়া, গান শোনা ইত্যাদির মাধ্যমে। তবে আমি মনে করি, মনের বিষাক্ততা দূরীকরণের (গবহঃধষ উবঃড়ী) অন্যতম মাধ্যম হতে পারে প্রকৃতির মাঝে ঘুরতে যাওয়া বা ভ্রমণ করা। প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যাওয়া কিংবা নতুন প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজের মনকে উজাড় করে দিয়ে সৌন্দর্য উপভোগ করার অভিজ্ঞতা মানসিক বিষাদময় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমাধান হতে পারে। এছাড়াও ভ্রমণ করার মাধ্যমে আমরা নিজেদের জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা উন্নত করতে পারি।

প্রমোদভ্রমণ কীভাবে মানুষের মনের বিষাদ বা বিষাক্ততা পরিশোধন করতে পারে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- **প্রকৃতির বিশালতায় হারিয়ে যাওয়া:** শহরের কর্মব্যস্ততা কিংবা একই জায়গায় থাকতে থাকতে আমাদের অনেক সময় প্রকৃতির বিশালতা উপলব্ধি করা হয় না। ভ্রমনের পরিকল্পনা এবং তদানুযায়ী ভ্রমনে গমন করলে প্রকৃতির সাথে মানসিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়; যা মানসিক চাপ প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- **সাময়িকভাবে পরিবেশের পরিবর্তন:** নতুন কোন জায়গায় ভ্রমণে গেলে সেই জায়গার সৌন্দর্য একজন মানুষকে বিমোহিত করতে পারে। সেই সাথে একঘেয়েমী এবং একই ধরনের পরিবেশ থেকে নিজেকে আলাদা করা যায় যা মানসিক বিষাদ দূর করতে পারে।

- **প্রযুক্তির এবং সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তি থেকে মুক্তিলাভ:** প্রযুক্তি এবং সোশ্যাল মিডিয়ার অধিক ব্যবহার অনেক সময় চিন্তা ভাবনা, নিরাপত্তা, আত্মবিশ্বাস ও নেতিবাচক মানসিকতার সাথে কোন ব্যক্তিকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলে। সাময়িকভাবে মুক্তি পেতে প্রযুক্তি এবং সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে থাকলে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যপক উন্নতি সাধিত হতে পারে।

- **নেতিবাচক ভাবনা থেকে মুক্তি:** আমরা আমাদের ব্যক্তি জীবনে অনেক সময় হতাশাগ্রস্থ হয়ে নেতিবাচক চিন্তাভাবনায় মগ্ন থাকি যা মনকে বিষাক্ত করে তোলে। ভ্রমনে গেলে নতুন পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে পরিচয় এবং কথাবার্তার মাধ্যমে মানুষ নেতিবাচক ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে যা মানসিক প্রশান্তি প্রদান করে।

- **মনোনিবেশ এবং একান্ত সময়:** ভ্রমণ সময়ে প্রয়োজনে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে মনোনিবেশ করা যায়। এছাড়াও নিজের সাথে একান্ত সময় কিংবা ধ্যান করার মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি অবলোকন করা যায়। এই মানসিক প্রক্রিয়া আপনার মানসিক বিষাদ কমিয়ে আনতে সাহায্য করতে পারে।
- **নতুন অভিজ্ঞতা:** ভ্রমণ সবসময়ই নতুন অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। নতুন মানুষের সাথে যোগাযোগ সৃষ্টি, ভাষার মৌলিক ধারার জ্ঞান, নতুন ধরনের খাবার ও জীবন যাত্রার ভিন্নতা মনের চিন্তাধারার পরিধি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **ব্যক্তি স্বাধীনতা উপলব্ধি:** ভ্রমণের সময়ে আত্মনিরীক্ষা করা, নিজের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং নিজের প্রিয় কাজগুলি করতে সক্ষম হই। নিজের কর্মব্যবস্ততা ও সাংসারিক জীবন থেকে ছুটি নিয়ে ভ্রমণে গেলে সাময়িকভাবে নিজের ব্যক্তি স্বাধীনতা উপলব্ধির পাশাপাশি মানসিক প্রশান্তিও পেতে পারি।

ভ্রমণের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিভিন্ন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ উল্লেখ করা হলো:

- **উপযুক্ত সময় নির্বাচন:** ভ্রমণের পরিকল্পনা করার জন্য প্রথমেই যে বিষয়টি মাথায় আসে তা হলো ভ্রমণের সময় নির্বাচন। সাপ্তাহিক যে ছুটি পাওয়া যায় তা দিয়ে আশেপাশে ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা করা যেতে পারে। তবে ১/২ সপ্তাহ কিংবা তার বেশি ছুটি নেয়ার ক্ষেত্রে অফিসের ব্যস্ততা এবং কর্তৃপক্ষের সদয় অনুমোদনের বিষয়টি মাথায় রাখতে হয়। এছাড়াও অনেক সময় দেখা যায় ভ্রমণসঙ্গীদের সাথে সমন্বয় করা একটু কঠিন হয়ে পড়ে।
- **ভ্রমণের স্থান নির্বাচন:** অনেক সময় দেখা যায় ভ্রমণের পূর্বে ভ্রমণের স্থান নির্বাচনে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে দ্বিধায় পড়তে হয়। এছাড়াও স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক সময় 'টুরিস্ট সিজন' মাথায় রেখে পরিকল্পনা করতে হয়।
- **নিরাপত্তা:** যে স্থানে ভ্রমণে যেতে ইচ্ছুক উক্ত স্থানের যানবাহন এবং আবাসন ব্যবস্থাপনায় নিরাপত্তা জনিত বিষয় আমলে নেয়া অত্যন্ত জরুরি।
- **শারীরিক স্বাস্থ্য:** মানসিক প্রশান্তির জন্য ভ্রমণ হলেও শারীরিক স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনায় রাখা বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ আমরা মনের জোরে অনেক সময় শারীরিক অবস্থার কথা ভুলে যায়। এছাড়াও দূর্গম স্থানে ভ্রমণের সময় অতিরিক্ত শারীরিক কসরত ও যানবাহনে ভ্রমণ শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটাতে পারে।
- **ভ্রমণের ব্যস্থাপনা:** ভ্রমণের প্রাক্কালে ও ভ্রমণের সময় সঠিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সংকট নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। যানবাহনের সময় ও বিবরণ, আবাসন, খাবার, দর্শনীয় স্থান নির্ধারণ ইত্যাদির পূর্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।
- **দর্শনীয় স্থানের আভ্যন্তরীন সমস্যা:** অনেক পর্যটন স্থানে জনসংখ্যার আধিক্য, পাবলিক পরিবহন, তাপমাত্রা ও পরিবেশের ভিন্নতা পানি ও শৌচাগারের সমস্যা ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়।
- **ভাষা ও সমাজ ব্যবস্থাপনা:** পর্যটন এলাকার সামাজিক নিয়ম কানুন এবং ভাষার ভিন্নতা একজন অপ্রস্তুত ভ্রমণ পিপাসু মানুষের যাতনার কারণ হতে পারে।
- **আর্থিক ব্যবস্থাপনা:** কথিত আছে- "ভ্রমণ পিপাসু মানুষের ভ্রমণের জন্য কখনও টাকার সমস্যা হয় না"। তবুও ভ্রমণের ক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনা ও বাজেটের ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। তাই ভ্রমণের কয়েক মাস পূর্ব থেকে টাকা জমানো প্রয়োজন যাতে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভ্রমণ মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। ভ্রমণের মাধ্যমে আমরা নিজেদের জীবনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পারি এবং আমরা প্রকৃতির সাথে এক হয়ে থাকতে পারি। দেশে এবং বিদেশে নৈসর্গিক স্থানসমূহে ভ্রমণ পরিকল্পনা গ্রহণ করলে একজন ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনযাত্রায় ভিন্নতার পাশাপাশি মানসিক অবসাদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। এই খনিকের জীবনে মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মে সেই সাথে যতদিন জীবিত থাকে অধিকাংশ সময় চলে যায় পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন জটিলতায়। নিজের জন্য সময় বের করা, কখনও ঘুরতে যাওয়া মানসিক বিষাদ প্রশমনে সাহায্য করতে পারে এবং মানসিক স্বাস্থের উন্নতি ঘটাতে পারে। সুস্থ্য ও সুখী জীবন যাপনের প্রস্তুতি সবার থাকতে হবে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে ভ্রমণ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

নিম্নবিত্ত মেয়ের গল্প

মেজর মোঃ মাহবুব আলম
কর্ড টু রেজিস্ট্রার
অফিস অব দ্য রেজিস্ট্রার, বিইউপি

নীলক্ষেত থেকে টি এস সি
প্রখর রোদকে ভ্রুকুটি দেখিয়ে হেঁটে চলেছে যে মেয়েটি
ছাতাহীন, অতি সাধারণ
হাতের মুঠোয় দশ টাকা চেপে ধরে,
তুমি তাকে চিনবে না।
কেননা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগত যানবাহনের উচ্চতা
অনুমতি দেয়না তার পায়ের মেরামতকৃত পাদুকার
সৌন্দর্য উপভোগের।

কোন এক উল্লাপাড়ার
এক অতি নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়ে সে।
অতিপ্রাকৃত কোন এক ভয়ংকর শক্তি
তাকে টেনে এনেছে এতদূর।
ক্যাম্পাসের ঝড়,
পাবলিক লাইব্রেরির বইয়ের গন্ধ,
টি এস সির আড্ডা,
কনসার্ট আর সম্মেলন চিনিয়েছে।

চিনিয়েছে নিউমার্কেটের ফুটপাতে
একশ টাকার স্যান্ডেলের দোকান,
ত্রিশ টাকার টি-শার্ট
আর বিবিধ ঝুলিয়ে রাখা হরেক রকম পোশাক।

নতুবা তারও কথা ছিল অন্তত এক সন্তানের মা হবার এতদিনে।
কথা ছিল অষ্টম শ্রেণি টপকাবার আগেই
বিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে

কোন দাম্ভিক ট্রাক শ্রমিকের তৃতীয় বধূ হবার
অথবা
চার চারটে পুত্র সন্তানের কোন গর্বিত জননীর মুখ ঝামটায় নিয়মিত অস্ত
যাওয়ার কথা ছিল ভাতের চুলোয়।

এভাবে টিউশনির দশ দশ টাকা বাচিয়েই
সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত মায়ের পথ্য কেনে,
বাবার আস্তিনে গুঁজে দিয়ে বড় বোনের যৌতুকের কিস্তি পরিশোধ করে,
কিংবা একটি স্প্রিং লোডেড গাড়ীর মূল্যে কেনে
ধুলোমাখা ছোট ভাইটির
এক ঠোট উল্টানো কান্নামঢ় হাসি।
সেসব সুখের কাছে
দশ টাকার ঘাম নিতান্তই অর্থহীন;
সেসব হাসির কাছে
রিকসাওয়ালাদের দর কষাকষিও বড্ড বেমানান।

তবে আজকের দশ টাকা তার নিজের জন্য,
একান্ত ব্যক্তিগত সঞ্চয়,
পেশীবহুল কোন অকাট্য বাহুতে নিজেকে বেঁধে
জীবনের বাকীটা পথ দুর্দম হাঁটতে চায় সে,
কিছুটা তোমাদেরই মতো।

বাতাসের উচ্ছ্বাসে

আল জামাল মোস্তফা সিন্দাইনী (তমাল)
সহযোগী অধ্যাপক
ডিপার্টমেন্ট অব সোশিওলজি

লম্বা-ছায়া অনেক দিন দেখেছি বাতাসের শরীরে
নিঃশব্দে হেঁটে যেতে পারিনি মনের ভাঙ্গা ঘরে
বিচিত্র সুবাসে ছুটেছি পথে পার হয়ে নদী
সাগরের হেমন্তে ভালোবাসার কথা মিশে গেছে বহুদূরে
ঝুলন্ত রাঙা বড় দালানের জানালায় চোখ রাখিনি
চোখের আড়ালে হারিয়ে গেছে নতুন দিনের চাওয়া।

অন্ধকার রাতে বাতাসের যৌবনে জাগরণ দেখিনি আমি
ঘাসের বুকে কান্না শুনেছি, ব্যাকুলতার সুরে সুরে
ভালোবাসার ভাঙ্গনে মন ভেঙ্গেছে অনেক নদীর ঘাটে
ভিন্নতর গতিতে সময় শুধু চলে গেছে অকারণে
মন জুড়ে তৃষ্ণার জন্য কিছুই মিলেনি শেষে
বিলের জলে শাপলার শরীরে দেখেছি মমতায় ভরা।

গভীরতার বিন্যাসে স্বপ্নীল আকাশের ছায়া দেখেছি বহুবার
মনের সীমানায় অনাগত দিনের শেষে দোয়েল ডাকেনা
সবুজের চৈতন্যে রাতের বৃষ্টিতে ব্যাকুল হই বারবার
মনের আঙ্গিনায় মধুর ভালোবাসার ডাক শুনি না আর
আলোকিত বিশ্বাসে দিগন্তের কাছে হেরে গেছি একা
ক্লান্ত নয়নে সুখের গন্ধে তবু পথ চলেছি।

আপন সজীবতা কবিতার খাতায় সহজে ধরা পড়ে না
উচ্ছ্বাসের কান্নায় কেঁদে অচেনা পথে ফুরায়নি
মায়ের হাসি মনে পড়লেই ব্যাকুল হই নির্জনে
দাদির আদর ভুলতে পারিনি অনেক বছর পরেও
প্রত্যাশার তীরে কেউ এসে দাঁড়ায়নি ভালোবাসা নিয়ে
বিবর্ণ আয়নায় অনেক সময় নিজেকে চিনতে পারিনা।

মানুষ

সামসেরি এ মাওলা লামিয়া
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব সোশিওলজি

একটু একটু কবে যে বুড়ো হয়ে গেছি
বুঝতে পারিনি।

আমিতো সেই আমাকেই খুঁজে ফিরি
আলমারির তাকে সাজানো শাড়ির ভাজে।

আয়নায় দাঁড়িয়ে চোখে কাজল আঁকি, লিপস্টিক দেই, টিপটা পরতে গেলে! কেনো যেনো আর পারিনা।

কানের কাছে ফিসফিসিয়ে কে যেন বলে-খয়েরী টিপে তোমাকে খুঁজে পাই!
পলকে হারিয়ে যায়!

নিখুঁত পরিপাটি করে নিজেকে সাজাই যেমন সাজতাম আগেও!
তোদের চোখেও পড়ে! কিন্তু আমার কাজ, আমার ছুটে চলা ও তোদের চোখ এড়ায় না!

মানুষ বুড়ো হলে! বুদ্ধি শুদ্ধিও বুড়ো হয়ে যায়!

তা না হলে! চারপাশ থেকে একই কথা ঘুরেফিরে আসে!
ও তুমি পারবে ন্স্থ সরে এসো!

বুঝতে পরিনা! কেনো আমাকে আর তোদের মোবাইলে ক্লিক করে না!

পোস্ট করা ছবির ভিতর বারেবারে নিজেকে খুঁজি!

নিজের অজান্তে সেলফি তুলি!
ছবিগুলো মিথ্যে বলে না!

আয়নায় দেখি নিজেকে; এ কোন আমি!
এতটাই বোকা! অভিমান করি, চোখে জল আসে!

যখন খুঁজে না পাই নতুন কোনো বাংলো বা নদীর ধারে পা ডুবিয়ে পানির সাথে খেলার দৃশ্য!
কেউ হাতটা ধরে বলে না-ধরে আছি পড়ে যাবে না!

চোখে ভাসে এই হাত দিয়ে তোদের আঙুল ধরে হাঁটতে শিখিয়েছিলাম!।

খেতে চাইতি না! যাদুর বাক্সতে কত কী থাকতো!
পুরো পৃথিবীটা গিলে ফেলতি-প্রতি লোকমায়!
এ্যাবরা কী ড্যাবরারা আর আসে না!

আমার টেবিলে শূন্য আসনটায় কেউ বসে না!
আরো একটু নাও-খুব মজা হয়েছে!
-আচ্ছা! কেনো বলতো! পানির গ্লাস ছাড়া খেতে বসো!

কারণ আমি বুড়িয়ে গেছি। আমার পৃথিবীটা এখন সাত ফিট বাই পাঁচ ফিটে টিকেছে।

গোটা পৃথিবীটা কর্ম ব্যস্ত, শুধু আমার কোনো কাজ নাই! আমি বুড়ো হয়ে গেছি!
কালে ভদ্রে ফোনটা বেজে ওঠে-কী করো!

-এইতো! কত কাজ করে এলাম, কাজ কি একটা!
- ও আচ্ছা। রাখি এখন।

চোখটা চলে যায়-শাড়ির আলমারিতে নয়!

ঔষধ রাখা সেল্ফে, যেখানে লেখা আছে
সকাল। দুপুর। রাত ।

বুড়োরা কি মানুষ!!
আমি এখন আমার সংসার সাজাই ছোট্ট মখমলের জায়নামাজে।

মনে মনে ভাবি সবুজ গালিচা-গাছে গাছে ফল-
হুরদের আনাগোনা, শীতল বায়ু আর সেই যুবতী আমি!

কোন পিছুটান নেই! কারণ কখনো কিছু
ছিলো না আমার।
।।।।

সূর্যমুখী ও বিইউপি

মোঃ মোজাম্মেল হক
শিক্ষার্থী
এমবিএ (জেনারেল) রেগুলার-২২ ব্যাচ

ধূসরের উষরের কর তুমি অন্ত,
হলুদিয়া পরশে কর গো শ্রীমন্ত;
আঁখিকোণে চেরাপুঞ্জির মেঘ,
অথচ সম্মুখে সদাহাস্য সদাসুখী;
এক স্নিগ্ধ রোদেলা শীতের সকালে তুমি
ফুটে ওঠা ঐশ্বর্যময়ী সূর্যমুখী!

বিইউপির লেকের পাশে, বিজয়িনী বেশে,
ফোটে ওঠো রোজ, আবেশিত করো ক্ষীণ সুবাসে;
হেথায় চঞ্চল মধুলিহ-ভৃঙ্গ গুঞ্জরি গায়
নিরালায় লভে মধু আর দোল খায় দখিনা বায়!
সূর্যের মুখ-পানে থাকো তুমি আঁখি পাতি,
গোপনে সিঞ্চন করো, সহস্র আবেগ-অনুভূতি;
বিলিয়েছো সুগন্ধের মাদকতা-
অনন্ত প্রেম আর সৌন্দর্যের বিলাসিতা,
চিরযৌবনা তুমি, চিরসুন্দরী অন্তর্মুখী!
মোর অন্তরের ভাবনারা হোক যেন
তোমারি মতো বারোমাসই সূর্যমুখী!

সকালের মেঘে ফুটেছে নব বিচিত্র রঙ,
মন মোর হারিয়েছে তব স্মৃতি-মাঝে
খুঁজে ফিরে ষট্পদ প্রজাপতির সঙ।
কখনও লাস্য, কখনও লড়াকু তুমি
তোমায় স্বাগত করি,
প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন সুন্দরতা যেন
তব দৃকপানে, আহা মরি মরি!

মেঘলা রোদে তুমি অদ্ভুত চলন্তিকা,
প্রেরণাময়ী রাধাপদ্ম, সুস্মিত সূর্যমণ্ডলের রাজটিকা।

এ হাওয়ায় তুমি নব স্বপ্নের দূরদর্শী,
ফুলে ফুলে মুখরিত, বিইউপি অহর্নিশি।
প্রকৃতির রাজহাঁসী, মোর সুরের দুলালি!
ভরা পাতায় ছায়াময়, মায়াময় তব আঁখি
মুখে হাসি মৃদু-সুস্মিত, তাই হয়েছিনু হেঁয়ালি।

পুষ্পরথ সাজাবো সখী, হবো তোমার কৃষ্ণ
হলুদিয়া রঙে রঙিন, হৃদয় হবে উষ্ণ!
কুঞ্জবনে প্রতিক্ষাতে কাটবে যখন প্রহর
মুখ-পানে চেয়ে মনের ভাব হবেনাকো ঠাওর।
পরিস্ফুটন হবে প্রেম, পুষ্পরেণুর মতো
ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবে পুষ্পশরের ক্ষত।

সূর্যের আলো ছড়িয়ে দিবসের নীল মেঘ,
হৃদয়ে ফুটে উঠুক সুপ্ত প্রণয়ের রেখ।
প্রণয়ের রেখ জানে নাকো কেবলই সীমা শেষ,
হৃদয়ে ভেসে যায় সে যে সৌন্দর্য অশেষ!

আলোর রানী সূর্যমুখী, এষিণু নীলাম্বর বস্ত্র,
বিইউপির প্রেমাবেগে, তুমি মোহনীর অস্ত্র।
সূর্য্যের মুখে সুখের আলো, জাগে প্রভাতের গান,
বিইউপির সৌন্দর্য্যে মেলে প্রতীক্ষার অবসান।
সৃষ্টির সৌন্দর্যে সঁচরণে-
মোর অন্তরিন্দ্রিয় রাঙাবো আর দর্শিব
সূর্যমুখী ও বিইউপি, এই দুইয়ের মেলা,
সূর্যমুখের আলোয় ব্যগ্র-উল্লাসিত তুমি
রঞ্জিতে প্রাতঃকালে স্বপ্নের ভেলা।

বিইউপির লেকের সৌন্দর্য আর,
নয়কো গো অতীতের ক্ষণ,
মৃদঙ্গ বাজে, মনমাতানো তোমারি ব্যঞ্জন।
সূর্যরশ্মি তোমার মঞ্চে আলোকিত হোক,
শোভায় শোভায় প্রতিমা সৃষ্টি, হবেনাকো মোক।
তোমার স্বপ্ন সৃজনে দিনটা ভরে যাক,
তোমারি বদন দর্শনে, মুলুকের তমিস্র লুকাক।

পিতা মাতা

মোঃ মশিউর রহমান অন্তর
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

যার জন্য তোমার রূপবান ধরণী দেখা,
যাদের কারণে তোমার গজালো পাখা,
তারপরেও যদি তাদের ছেড়ে দাও দূরে উড়াল,
তুমি কি জানো তাদের হৃদয়ে গিয়ে লাগবে শাণিত কুড়াল।

যে তোমাকে নয় মাস বহন করে নিজের করেছে ক্ষয়,
আর তুমি কিনা চেষ্টা কর পরের মনের জয়।
কষ্টে গড়া ছেলে মেয়ে কি এমনি নরপশু হয়?

যার পদতলে আমরা পাই জান্নাতের আভাস,
দুর্ভাগ্য, আমাদের মনে তার জায়গা নেই অন্যের বসবাস,
হঠাৎ করেই দেখবা একদিন হয়ে যাবে তাদের সর্বনাশ,
সেদিন আর উপলব্ধি করতে পারবে না তাদের নিঃশ্বাস,
তুমি যে এত নিষ্ঠুর ছিলে নিজেকে করতে পারবে না বিশ্বাস,
বলো আর কি হবে নিজেকে দিয়ে আশ্বাস,
তারা তো চিরতরে ত্যাগ করে গিয়েছে শেষ নিঃশ্বাস।

এত সহজ ভাষায় বলি তবুও যদি না বুঝ,
বুঝবে একদিন, যেদিন লাঠি ভর দিয়ে হবে কুঁজো।
সেদিন আর হবেনা কোনো লাভ,
পরপারে শুধু নিয়ে যেতে হবে অবহেলা আর পাপ।

পাউলোনিয়া

মোঃ কাইয়ুম আলী
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

এইতো সেদিনি জন্মেছিলাম।
সহস্র পদচিহ্নের আদী পদচিহ্ন-
এইতো সেদিনি সূচনা হলো।
অতঃপর, শত কংক্রিটের সিড়ি,
শত প্রাতিষ্ঠানিক দেয়াল...
উৎরেছি সেই কবেই।
তবু পেছন ফিরে তাকালে
গতকাল বা গতপরশুই দেখি।

ব্যস্ত দুপুর,
ঘর্মাক্ত সন্ধ্যা-
কোলাহলে মুখোরিত হাজারো দিন,
হাজারো নৈঃশব্দ্য ঘুটঘুটে রাত-
এসবই যেন দুদিন আগেরি কথা।
অপার্থিবতার মোড়ক ভেঙে বাস্তবতার মঞ্চে আজ
আগামী দেখি।

প্রশ্নবিদ্ধ আজ-
মহৎ কিছু করার সাধে।
সাফল্য নামক দিগন্তের পানে প্রসারিত হাত,
কর্মের ছাপ রেখে যাওয়ার দায়িত্ব আজ কাঁধে।

তাইতো, না হয়ে ভ্যাগাবন্ড দেউলিয়া
ভেঙে পড়ার আগেই হতে হবে-
আকাশচুম্বি পাউলোনিয়া।

হিমালয়ের বিশালতা

নুরুজ্জামান শিশির
প্রভাষক
ডিপার্টমেন্ট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ

হিমালয়ের বিশালতা নিয়ে
রয়েছো বুক চিতিয়ে
এভারেস্ট যেন এক,
তোমার বুক চেরা বহমান যে নদী
সেই পদ্মার জলস্রোতে এক বিন্দু জল আমি।
তোমার প্রিয় মাতৃভূমির গা ঘেঁষে চলতে চলতে
একদিন হারিয়ে যাবো প্রশান্ত সাগরের অতল গহ্বরে।
হয়তো ফিরবো আবার, হাজার বছর পরে,
ছন্নছাড়া বাস্পকণা হয়ে উড়তে উড়তে ঘুরতে ঘুরতে ....
আবার গলে পড়বো তোমার বাংলায়।
আর তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে ঠায়
আমার প্রতিক্ষায় হিমালয়ের মতো কিংবা বটবৃক্ষ।

ঘোড়-সওয়ারের জবানবন্দী

সৌমেন গুহ
প্রভাষক
ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ

এক ॥ মহাপ্রলয়

যদি প্রেমে পড়ে যাও, দুর্বার স্রোতের গর্জন কবিতার মতো শিউলি সৌরভ আনে;
অচেনা পথের মরিচীকা-ক্যাকটাসের অরণ্যে প্রতীক্ষার মতো নতজানু হয়ে জাগে।
প্রেমে কি পড়েছিলে?
নাকি কেবলি ছুটেছি কালপারাবার-দু'জনে।
নাকি অন্ধ ঋষির মতো মানসলোকে করেছি অবগাহন
দৃষ্টির অগোচরে?
তুমি না আমি ত্রিকালদর্শী?
সর্বভূক হরিণীর মতো প্রতিক্ষণ
দু'জনের ক্ষত প্রগাঢ় হয়-
প্রেমে না অপ্রেমে?

দুই ॥ নিশীথরাত

আকাশে তারাদের আনাগোনা-মেঘের ভেলায় চাঁদের লুকোচুরি
এই নৈসর্গিক রাতে-অনাহূতের মতো তুমি ফিরে আসো-
আমি আর তারাদের সংসারে উঁকি পাতি না
জানো তো আমার চোখে ভয়ঙ্কর শাপ
পুড়িয়ে ফেলে আমাকে, ফিরিয়ে আনে দুর্বার গ্লানি
কার্ণিশে দাঁড়িয়ে স্থলচর পৃথিবী দেখি
আমি তুমি সবই অর্থহীন
তবুও নোঙ্গর ফেলি তোমাতে
তবুও তুমি ফিরে আসো আমাতে।

তিন ॥ মহাপরিণয়

যদি প্রেমে পড়ে যাও, পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাবে না ঘর।
ঘরে ফেরার মোহে ছুটে চলি দিগন্তচারী শূন্যতায়।
দুরন্ত ঘোরসওয়ারের কাছেও প্রেম এসে ধরা দেয়;
আমাকে অর্থহীন করে তোলে

আমাকে অসম্পূর্ণ করে-
অরণ্য-নগর-সমুদ্র যেই তীরে যাই, শুনি তোমার হাসির প্রতিধ্বনি
আকাশের বিস্তৃত ক্যানভাসে দেখি তোমার মুখচ্ছবি।
পৃথিবীময় পুঁথিগন্ধেও একটি সুবাতাস আসে
তোমার আকুঞ্চিত দীঘল কেশবরণ মেঘে।
একি মোহিনী রূপ! একি মায়াবী জাল!
আমাকে খুন করে-আমাকে স্থবির করে।
এক সাইমুম ঝড়ে তুমি এসে ভীড় করো আমার বন্দরে;
আমার দু'চোখে তুমি রাজ করো-
দূরতম শৃঙ্গের মতো
যতই ছুটি-তবুও নাগালহীন হয়ে যাও।
সেই এক রাতের বিভ্রম!
জন্মান্ধ হওয়ায় ঢের ভালো ছিল তবে।
ঘোড়ার লাগাম টেনে গুপ্তধনের সন্ধান ছিল আমার নিমিত্ত
তবুও পথ আগলে ধরে ভালোবাসার ব্যারিকেড।
আমি বিমূঢ় হয়ে যাই! ঘোড়াটাও ব্যারিকেড ডিঙিয়ে
অন্তলীন হতে জানে না-জানে পথিকেরও গল্প আছে শোনানোর।
তোমার গল্প শোনা হল না আমাদের-
তুমি মিশে যাও যেভাবে এসেছ সাইমুম ঝড়ে।
একে কি প্রেম বলে?
যেভাবে তুমি কড়া নাড়ো প্রতিদিন
যেভাবে তুমি ফিরে আসো
আমার একান্ত অবাধ্য অনভূতির বেশে
যেভাবে তুমি আমাকে বশ করো
আত্মগ্লানিতে, শূণ্যতায়, অপূর্ণতায়।
তবুও জেনে রাখ-আমি জেনেছি তোমাকে সত্যে,
কোলাহল-রূঢ় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠা রূপে।